

কুমুদনাথ চৌধুরী

বিলে
দাখলে



কুগুদনাথ চৌধুরী

ঝিলে জঙ্গলে

৫২

অলকা চৌধুরী অনুদিত

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম নাথ পাবলিশিং সংস্করণ

পৌষ ১৩৮৩

জাহ্নয়ারী ১৯৭৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ

আষাঢ় ১৩৯১

জুলাই ১৯৮৪

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট

গৌতম রায়

ছবি

ঋতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রক

রবিনন্দন ঘোষ

শ্রীহর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২১বি রাধানাথ বোস লেন

কলকাতা ৭০০০০৬

© অলকা চৌধুরী

28.10.2010
14249

ভূমিকা।

এই বইয়ের মূল লেখকের মতো অনন্যসাধারণ মানবকেও লোকে ভুলে গেছে। সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। পঞ্চাশ বছর আগে কুমুদনাথ চৌধুরী একজন নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন। তাতেই যথেষ্ট বলা হল না; ব্যারিস্টারিতে তাঁর যত নাম ছিল, তার চাইতেও তাঁর অনেক বেশি নাম ছিল একজন অসাধারণ বাঘ-শিকারী বলে। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার কথা কম লোকেই জানত। ৬৯ বছর বয়সে, কালাহাণ্ডির বনে তিনি বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত ভারতে তাঁর মতো একজন নির্ভীক, বলিষ্ঠ বাঘ-শিকারী দেখা যায়নি।

তাঁর মতো মানুষেরই এখন ভারতের প্রয়োজন। এক দিকে পৌরুষের প্রতিমূর্তি, অন্য দিকে স্নেহের গঙ্গোত্রী। বাংলার সামাজিক জীবনের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন তিনি। এমন গুণগ্রাহী শিল্প-সাহিত্যপ্রেমিক খুব বেশী হয় না। এত রূপবান পুরুষও আমি কম দেখেছি। আজও তাঁর সতেজ সুন্দর মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসে। এমন চেহারা বাঙালীদের সচরাচর হয় না। আমি তাঁকে রোদে ক্লিষ্ট, ক্লান্তদেহ বন্দুকধারী শিকারীর বেশেও দেখেছি। আবার উড়ুনি গায়ে, আঁমির পাঞ্জাবি আর কৌচানো ধুতি পরা, শান্ত প্রসন্ন বদনেও দেখেছি। ধূতির মৃদুগার পাড়িটির রঙই বেশী সুন্দর, নাকি তার গায়ের রঙ বেশী সুন্দর ভেবে পাইনি।

পাবনা জেলার হরিপুর্নে তাঁদের নাতিবৃহৎ জমিদারী ছিল। সাতটি ভাই, তার মধ্যে পাঁচজন ব্যারিস্টার, দুজন ডাক্তার। সকলেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, নিজের নিজের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান। সবার বড় স্যার আশুতোষ চৌধুরী, তৃতীয় ভাই কুমুদনাথ, তাঁর পরেই সবুজ-পত্রের স্বনামধন্য সম্পাদক প্রমথনাথ। কুমুদনাথের সাহিত্যপ্রতিভা প্রমথনাথের তুলনায় কম উজ্জ্বল হলেও, নিতান্ত নগণ্য ছিল না। এই বই তার একটি প্রমাণ। এ ছাড়াও এখানে ওখানে নানান পত্রিকার পাতায় তাঁর বহু সরস প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে, কেউ সেগুলিকে উদ্ধার করলে বাঙালী পাঠক কৃতজ্ঞ হবে।

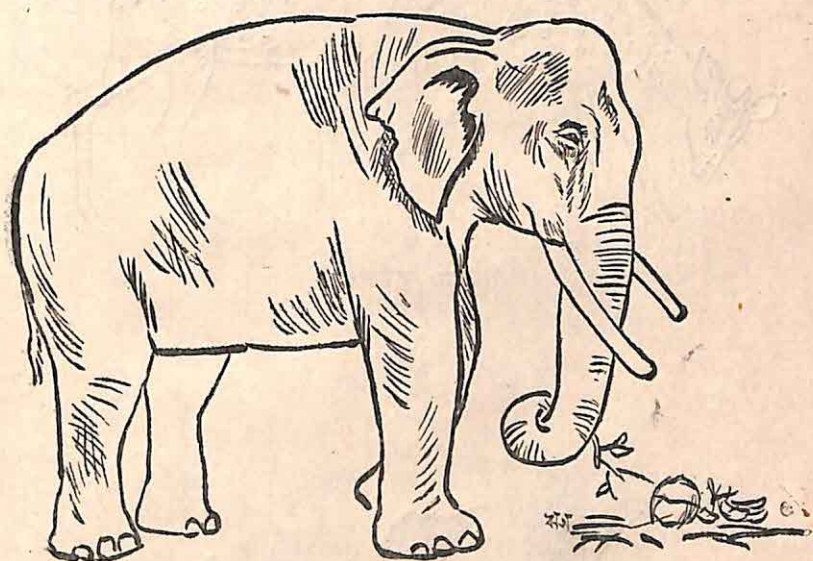
কুমুদনাথ বিবাহ করেছিলেন সেকালের স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অতিশয় সুন্দরী কন্যা রাধারাণীকে। তাঁদের চারটি সন্তানের মধ্যে সবার ছোট কালীপ্রসাদ ২৫ বছর বয়সে গত মহাযুদ্ধে বীরের মতো বরণ করেছিলেন। বড় ছেলে কল্যাণ পিঁ্ডিচেরীবাসী ও শ্রীঅরবিন্দের প্রিয় শিষ্য।

এই বইখানি মলে ইংরিজি “Spart in Jheel and Jungle” থেকে অনুবাদ করেছেন কুমুদনাথের বড় মেয়ে শ্রীমতী অলকা চৌধুরী। বর্তমানে ইনিও পিঁ্ডিচেরীবাসিনী। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী করুণা দেবী কলকাতায় থাকেন।

এই বইয়ের ভিতরের ছবি এঁকেছেন শ্রীমতী অলকা চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী ঋতা গাঙ্গুলী। ঝিলে জঙ্গলে শিকারের বাংলা অনুবাদ বছর পঞ্চাশেক আগেও একবার প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক ছিলেন কুমুদনাথের ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবী। সে বই এখন বিরল। এক সময়ে প্রিয়ম্বদা দেবীকেও বাঙালী মাঠেই চিনত।

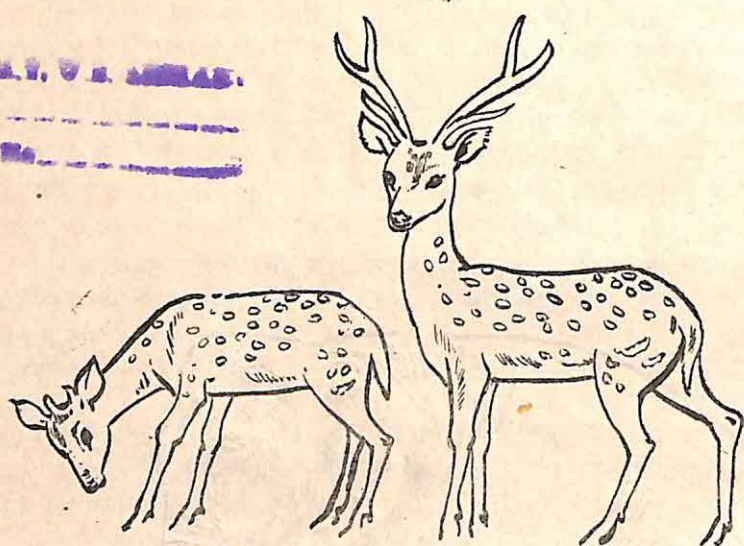
এঁরা ছিলেন বাঙালার চিরন্তন আদর্শের বাহক। এঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত এক ধরনের প্রবল দেশপ্রেম বিরাজ করত, যার জন্য এঁদের স্বকীয়তার তুলনা ছিল না। সমাজনীতি ও রাজনীতির উপরে থাকে যে আদর্শ সে কখনো সেকেলে হয় না। এঁদের জীবন তারই প্রমাণ।

লীলা মজুমদার

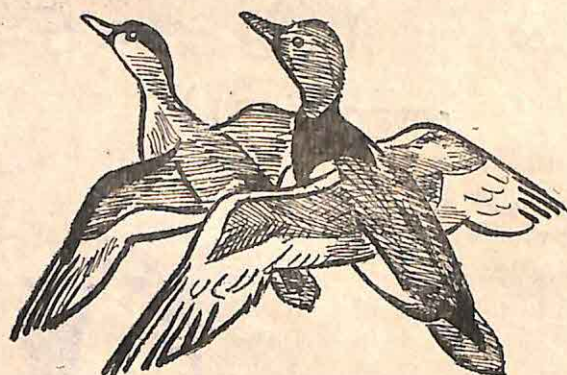


মোহনলাল (হাণী)





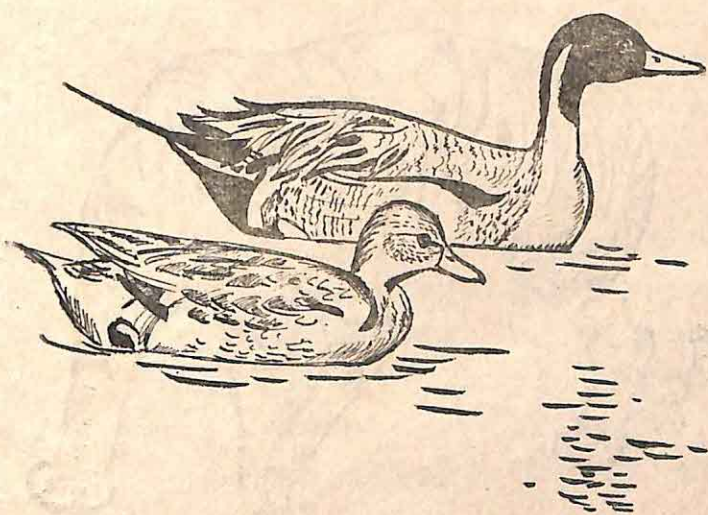
ଚିତ୍ତେଲ ହରିଣ



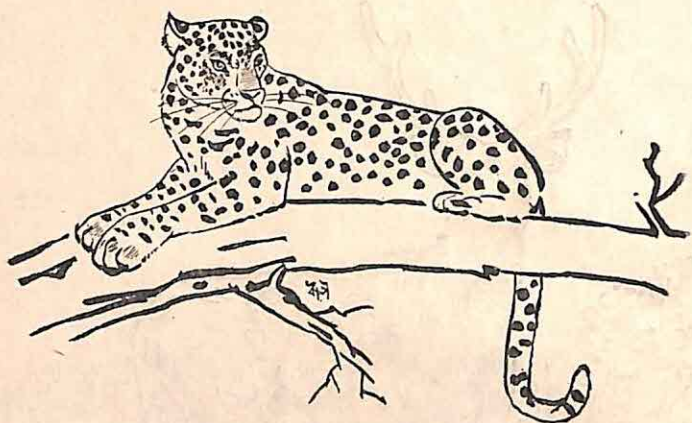
ବୁନୋ ହାଂସ



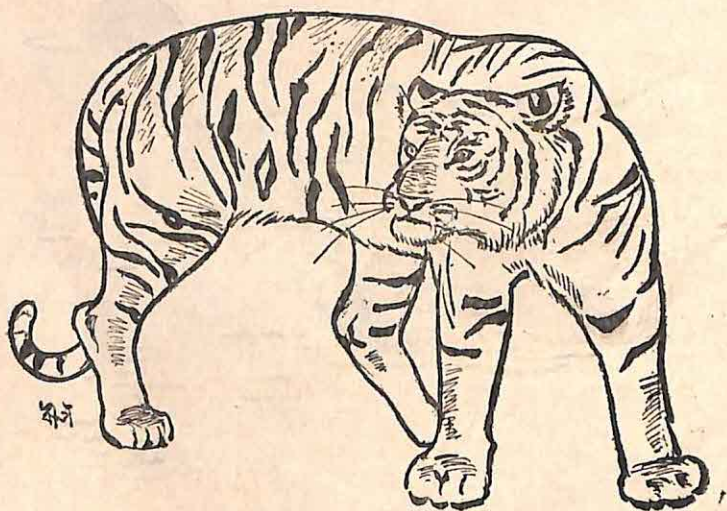
সাম্বার হরিণ



শিশুল বুঝে হাঁস



চিতাবাঘ



বাঘ

চেষ্টা করেছি। তুমি ও ছোট্ট অলকা (যদিও তোমার মতে মেয়েদের এ সব শিখে কি হবে ?) কত সময় হাতীতে চড়ে 'স্নাইপ' মারা দেখেছ—ঠিক হয়ত বন্দুক তুলে মারতে যাব কিন্তু ডিঙ্গি পদ্ববনে ঢুকতেই, তুমি শিশুহুলভ উত্তমে টেঁচিয়ে লাফিয়ে, পাখী আচমকে উড়িয়ে দিয়েছ। তোমরা জান আর ক'দিনের মধ্যে বাংলার জলা-জমিতে 'স্নাইপ' ভরে যাবে। এই পাখীর কান লম্বা ঠোঁটের উপর থাকে—চোখের আগে। কেন থাকে বুঝিয়ে দেবার পর তুমি বারবার পাখীগুলো তুলে পরখ করে দেখেছ। আমি আরেকটি পাখির এরকম কান দেখেছি—সেটি উড্‌কক্ (Woodcock)—এটি স্নাইপের মতো—আরও বড়। এরা কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে শুক্লপক্ষের চাঁদনী রাত বেশী পছন্দ করে। কাজেই শীঘ্রই এসে পড়বে। তুমি সহজেই প্রত্যেকটির বিশেষত্ব জানতে পারবে—কোনটির ছুঁচের মতো লেজ, কারটা পাখার মতো—আর ছোট্ট জ্যাকস্নাইপের (Jacksnipe) তো কথাই নেই—একটি মারলে আরেকটি খুঁজে আনতে হয়। তোমরা সংখ্যায় বেড়েছ—এতগুলি জ্যাক্ (Jack) আমার পক্ষে আনাও সম্ভব নয় তাই সবার ছোট কালীবাবুকে আগে দিতে হবে, বিশেষত সে যখন লাটসাহেবের মতো সকলের উপর জুলুম চালায়।

আজ আর স্নাইপের বিষয় বলব না।

হরিপুরে আমাদের গ্রামের পৈতৃক বাড়ির বারান্দায় বসে তোমরা প্রতি সন্ধ্যায় করাত চালাবার মতো চিতাবাঘের আওয়াজ শুনেছ—আমার গুলিতে মরার আগে পর্যন্ত সে শব্দ থামেনি। তুমি জান আমি ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে নিজেকে আড়াল করেছি—এগুলো খুব বড় বা ঘন না হলেও লুকোবার পক্ষে যথেষ্ট। কতদিন তুমি মোহনলালে (হাতী) চড়ে বনের বাইরে বেরোবার আগেই গুলি শুনে ফিরে এসে দেখেছ, গলায় গুলি লেগে মস্ত চিতাবাঘ ধুলোয় মরে পড়ে আছে। আমাদের দেশে (হরিপুরে) খুব বুনোশুয়ার আছে—পাবনার বন্যবরাহের বপু বিশাল, চতুর চিতাবাঘেরা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, স্থবিধে পেলেই অসহায় শুয়ারছানা খেয়ে বেশ হুটপুট হয়ে যায়। বনের ভিতর যে সব সরু পথ দিয়ে জানোয়ার চলাফেরা করে এবং তাড়া খেয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে তাও সহজে জানা যায়—এ বিষয় তোমায় যা বলব তাতে এ জ্ঞান তোমার সহজলভ্য হবে ও তুমি নির্বিঘ্নে পায়ে হেঁটে শিকার করতে পারবে। আমরা যে সব দুর্ঘটনা, শিকার করতে ঘটে শুনি তার বেশীর ভাগ অনভিজ্ঞতা ও দুঃসাহসিকতার জন্মই হয়। শিকারে বিপদের আশঙ্কা থাকেই নইলে তাতে উৎসাহ বা আকর্ষণ কিছুই থাকবে না—

সে খেলার দাম নেই কিছু
 খেলোয়াড় ধায় যার পিছু
 আছে তাতে বিপদের নেশা
 আছে ভয় লড়ালড়ি মেশা ।

আমার এই সব চিঠি থেকে অনেক কিছুই জানতে পারবে—প্রথম যেদিন তুমি বন্দুক হাতে শিকারে নামবে—তার জন্ত তোমার যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে, তা সন্দেহ যদি পাকা শিকারী না হতে পার, তার জন্ত আমি দায়ী হব না । শুধু প্রাণী হত্যা করলেই দক্ষ শিকারী হওয়া যায় না । আমরা সকলেই জানি ইংরিজিতে ‘Gentleman’-এর মানে—বাংলায় এক কথায় বলা সহজ নয় । জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে দয়া, দাক্ষিণ্য, ভদ্রতা, কৌলিন্য দেখাতে পারে—সেই আসল ‘Gentleman’—আমাদের জীবনে চারদিকে অনেক বাধা বিপত্তি—শিকারেও দেখবে কত হিংসা, ঘেঁষ, নীচতা—কত অভদ্রতা । তোমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় তুমি মহাভারত বেশী পড়েছ তাই জীবনে কিভাবে চলতে হয়, সে বিষয় আমার ভাবনা নেই । ইংরিজিতে বলে ‘It must be cricket, you must play the game.’ এ কথাটা তাৎপর্য তোমার মনে বসিয়ে দিতে চাই—জার্মান, ইংরেজের যুদ্ধে এর প্রমাণের অভাব নেই—যে ভাল খেলোয়াড় সে-ই ভাল যোদ্ধা হতে পেরেছে । যুদ্ধে তারাই বীরত্ব, সাহসিকতা, ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে—কারণ এ সব খেলার মাঠেই শিখেছে । আমি লক্ষ্য করেছি ফুটবল খেলার ছড়োছড়িতে তুমি খুব মজবুত ও ক্রিকেটেও পটু—তাতেও তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্ষিপ্ৰতা ধৈর্য বাড়বে ও শরীর সবল ও দৃঢ় হবে, কষ্টসহিষ্ণু হতে শেখাবে ও চরিত্র গড়ে তুলবে । এই সব গুণ কোথাও না কোথাও সর্বদা ‘মানুষ’ গড়ে তোলে । ইংরেজ ছেলেদের খেলায় অদম্য উৎসাহ জীবনের বিপদে ও যুদ্ধক্ষেত্রে খাড়া রাখতে পেরেছে । আমি বলতে পারি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খেলার মাঠের পারদর্শিতা তাদের চরিত্র দৃঢ়তর করেছিল—তাই তারা বিপুল সংগ্রামেও অটল ছিল । আমি তাই তোমায় ও তোমার ছোটভাইকে বলতে চাই যে স্বদেশের সম্মান রক্ষার আরম্ভ ঐ খেলার মাঠে ও খেলাঘরে । জীবনের আকাজক্ষা স্বপ্নের মত মিলিয়ে আসছে তাই আমি যা করতে পারিনি তোমরা তা পারবে । স্বদেশপ্রেম তখনই বুঝবে যখন তোমার দক্ষিণ হাতের উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করবে, জাতি বর্ণ না মেনে সকলের সঙ্গে নির্বিচারে পাশাপাশি সমান হয়ে দাঁড়াতে পারবে । আমি চাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পাকা খেলোয়াড় হও ।

ধর ছিপ, মার বন্দুক করহ শিকার
করহ পালন কর্তব্য সব ছুনিয়ার
সাবাস জোয়ান হও হ'শিয়ার ।

বাড়বে শরীর দৃঢ় হবে মন
ভিতর বাহির সকলই সমান

বিপদে পরোয়া কার ?

সবার পছন্দ নয় যে সমান
নাকে কাঁদে ভীক, মনে তার ঘুণ

ভয়ে ভয়ে থাকে পিছনে সবার
খেলোয়াড় হয় বড় পালোয়ান

বিপদে থাকে সে সামনে সবার ।

শিকারে যে সব শিক্ষা হবে
মনের নীচতা দূরে চলে যাবে

নিয়ে বন্দুক, তীর, তলোয়ার
করগো শিকার ।

চিঠি শেষ করার আগে আরও ছ' একটি কথা বলে রাখি—পৃথিবী আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতির যে সুন্দর বই খুলে রেখেছে, তার চেয়ে ভাল কিছু নেই, রোজই নতুন কিছু খুঁজে পাবে—একঘেয়ে হবে না। বৈজ্ঞানিক আপন খেলার উল্টো চশমা লাগান—সত্য মিথ্যা ভিন্ন দেখায়। যারা মাঠে মাঠে প্রকৃতির তত্ত্ব খুঁজে বেড়ান, তাঁরাই সঠিক খবর পান। সতর্ক দৃষ্টিতে সব দেখো ও যা দেখবে মনে রেখ। শুধু যে সব জানোয়ার শিকার করবে তাছাড়া অন্য জন্তুরও চলাফেরা হাবভাব সবই আশ্চর্যজনক—পাখীদের বিষয়ও একথা খাটে। যখন শিকারের খবর পাচ্ছ না, দিন কাটে না মনে হবে না, যদি চারিদিকে পশুপাখী ও প্রকৃতির খেলা লক্ষ্য কর, সময় কোথা দিয়ে কাটল বুঝতে পারবে না।

কৃষি-জমি বাড়ার সঙ্গে শিকার কমে আসছে—তাই আমি যে সুবিধে পেয়েছি তোমার তা হবে না হয়ত। শিকার করার আরও কারণ বনজঙ্গল গাছপালা কেটে চাষজমি ও লোকালয় তৈরী হচ্ছে—তবে এ বিষয় আমার বলার অধিকার নেই। যে সব জায়গায় বুনোমোষ চরত তারা অন্ত্র চলে যাওয়ায় ; বাঘভাল্লুকও তাদের খোঁজে সে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তোমায় হয়ত শিকারের জন্ত দূর দূরান্তর যেতে হবে, তাতেও নিফল হবে না যদি তোমার অশেষ ধৈর্য থাকে। যদি প্রকৃতিবিদ

হতে পার তাহলে পাহাড় পর্বত খালবিল নদী বন-জঙ্গল জলাশয় সব অশেষ
কৌতূহল মনে আনবে যা জীবনে ফুরবে না। দেখ না পাখীদের গায়ের রঙ কত
সময় বদলায়, কেন এরকম হয় বুঝতে গেলে মনোযোগ ও বুদ্ধির দরকার। রোদের
ঝিলমিল বনের পাতার ভিতর দিয়ে কোথাও গোল হয়ে পড়ে আর বড় বড় গাছ
থাকলে লম্বা হয়ে পড়ে—এই জন্তু চিতাবাঘের গায়ে গুল ও বাঘের গায়ে লম্বা
ডোরাকাটা। জঙ্গলে তাই এদের সহজে দেখা যায় না ও তারা অনায়াসে ও
অলক্ষ্যে বনজন্তু শিকার করতে পারে। তৃণজীবী জন্তুদের গায়ের রঙ ঘাসপাতা
মাটির সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে শত্রুর চোখে পড়ে না—তবে এরও অত্থা আছে
—দেখা গেছে শত্রু পরিবেষ্টিত হলেও রঙবেরঙের পশুপাখী সেখানে আছে। ঋতু
বদলের সঙ্গে পশুপাখীর রঙ আবার বদলায়—আর যেখানে শত্রুসংখ্যা কম সেখানে
জাঁকাল রঙের প্রাচুর্য। রঙ বদলায় যখন এরা বর বৌ খুঁজতে বেরোয়। প্রকৃতির
নানা রহস্য জানতে হলে তোমার নিজের অধ্যবসায় দরকার—আমি শুধু পথ-
প্রদর্শক।

১২ই আগস্ট ১৯১৭

স্নেহের অলকা,

প্রথম চিঠিতে উঁকি দিয়েই দেখেছ সেটা তোমার ভাইকে লেখা হয়েছে।
অভিমনে চোঁট ফুলল যে এ চিঠি ছুঁজনকেই লেখা চলত—কল্যাণকে অরণ্যবিছা
শেখান ও তোমায় শিকার কাহিনী শোনান—যা শুনে তুমি সর্বদা উৎসুক।
আর ক'বছর পরে তোমায় হিন্দুনারীর যোগ্য গৃহলক্ষ্মী হতে হবে—হয়ত তোমার
মনে সে সাধ আছে, কারণ প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতির আদর্শের সহজ সরল পরি-
বেশে গড়ে উঠেছে। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এসেছে—সুদূর পশ্চিমে
তোমার বিদেশিনী বোনেরা জীবন বৃথা কাজে ব্যর্থ করে—যদিও তাদের সংখ্যা
কম। অনেককেই শেখাতে হয় স্ত্রী হওয়া ও মাতৃহীন নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সব নতুন
কর্মপথ নারীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে—সেখানে তাঁরা পুরুষের কাজেও
সুনিপুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন, দেখে তাঁদের প্রশংসা না করে পারা যায় না কিন্তু
এ সব কর্তব্যপালন করে তাঁরা যতই খুশী হন, তাঁদের সম্পূর্ণ মনস্তৃষ্টি হয় না।
পুরুষের সঙ্গিনী দরকার এবং স্ত্রীলোকেই তা পূর্ণ করতে পারে—এতে আর সন্দেহ

কি ? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের সমষ্টি—পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যক্তিগত । আমাদের দেশে স্বদূর অতীত থেকেই পরিবার সমাজ ও সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে এসেছে । নরী শুধু সভ্য সভ্যতা গড়ে তুলেছেন নয়—বর্বরতার প্রভাবে নেমে যেতে বাধা দিয়েছেন—পা বাড়াতেও দেননি । গৃহকে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গৃহলক্ষ্মীর স্থনিপুণ প্রভাব সমাজের উপরও পড়ে—সে তুলনায় পাশ্চাত্য ‘ফ্যাসানেবেল’ বলমলে উপর-চটকা জীবন অনুকরণে তা তুচ্ছ ও অসুন্দর করে কোনও লাভ নেই । এই সব নতুন জীবনের শ্রোত অল্লবিস্তর এ দেশেও পৌঁছেছে—তবে তোমায় তা ধরা-ছোঁওয়া দেবে না, তাও সাবধান করে দি কারণ অনেকে এই বিদেশী আবহাওয়ায় বিনা বিচারে চোখ বন্ধ করে গা ঢেলে দিয়েছেন ।

এখন থেকে সব চিঠি তোমাদের দুজনকেই লিখব । তুমি শিকারের জীবনের আনন্দ ও বিপদের মর্ম বুঝতে পার—কেন তোমায় সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি না তাও জান । তোমার পরম ভক্ত, অরুরক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও আমার মতে মত দেবেন । বাগান যখন নানা রঙের ফুলে ভরা, আকাশ সূর্য্যকিরণে বলমল করে আর কত রঙবেরঙের পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে শিকারের গল্প শুনে ঘিরে নেয় তখন আমার মন গৌরব ও সন্তোষে ভরে ওঠে—তাই আবার সেই সব গল্প তোমাদের বলছি ।

২০ শে আগস্ট ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

শিকারে ব্যাঘ্র মহাশয়কেই শ্রেষ্ঠপদ দেওয়া উচিত—তিনিই শিকারের রাজার রাজা । যদিও সংখ্যায় তারা বেশী নয় তবু আমাদের বিশাল বিস্তৃত জঙ্গলে এদের নির্বংশ হবার সম্ভাবনা কম । অনেকে মনে করেন শিকারীরা এদের বংশক্ষয়ের জন্য দায়ী—এটা হয়ত আফ্রিকা ও আমেরিকার পক্ষে ন্যত । হরিণ, বুনোমোষ ও অন্ত ছোট জানোয়ারের সংখ্যা হ্রাস সর্বত্র হয়েছে । যে শিকারী শিকারের নিয়ম মেনে চলে সে অবধা জীবহত্যা করে না—প্রকাণ্ড বাঘ ও খুব বড় শিং-এর হরিণ এক আধটা মারে । শিকার যাদের ব্যবসা ও গ্রামবাসী যাদের (নতুন করে) বন্দুক আছে তারাই নির্বিচারে জন্তু জানোয়ার মারে । কোনও

কোনও জায়গায় এরকম জীবহত্যা দমন করার চেষ্টা করা হয় না তবে কোথাও কোথাও এ সবেল প্রতিবিধান চলেছে। আরও সাবধান ও সতর্ক হওয়া দরকার তা নয়ত যে সব দৃশ্যের আনন্দ উপভোগ করলাম আমাদের বংশধররা তার ভাগও পাবে না।

অনেক বছর আগে কটকের জঙ্গলে প্রায় তিনশ লোক শিকারের হাঁকা করতে আসত—তাদের প্রায় সকলের কাছে ছবির মতো সেকেলে বন্দুক থাকত—শিকারের পর দিনের শেষে তাঁবুতে সকলে প্রাণে বেঁচে ফিরেছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছাড়তাম। তারা প্রায় তিরিশ কুট দূরে দূরে দাঁড়াত—আর যে হতভাগারা পয়সার জোরে বা বাপ দাদার ঐ অদ্ভুত শয়তানী অস্ত্র পায়নি তারা পাহাড়ের মাথায় চড়ে—ভূতের মতো অমানুষিক চিংকার করে ঢিল ছুঁড়ত। শিকার খেদিয়ে জড় করার উদ্দেশ্য—সে চেষ্টার ফল কিছুই হত না। ময়ূর, ‘চিঙ্কারা’, হরিণ, সজারু, গুয়ারছানা যা কিছু পাশ দিয়ে গেলেই এরা তাদের ঐ কিস্তুতিকিমাকার সেকেলে বন্দুক ছুঁড়ত—মানুষ বা জানোয়ারের কোনও বিপদ ঘটতে যদিও দেখিনি তবে শুনেছি অনেকে মরতে মরতে বেঁচেছে—এ সময় বিপদ না ঘটাই নিয়মের ব্যতিক্রম। এই সব জঙলি বুনোলোক জঙ্গলের পথঘাট চেনে—এরাই নির্বিচারে জীবহত্যা করে সে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ। এ কারণে ভারতের জীবজন্তুর সংখ্যা কমে আসছে। প্রধান যে শিকারী আমায় সাহায্য করার জ্ঞান নিযুক্ত হয়েছিল, সেও এ প্রলোভন ছাড়তে পারেনি—হরিণ মারতে বনে গিয়েছিল—আমি সেই সকালেই পৌঁছেছি। বাঘের পায়ের দাগ দেখতে ভোরে সে বেরোয়, খোঁজ খবর নিয়ে তাঁবুতে ফিরবে। আমরা একটি মহুয়া গাছের তলায় তার রক্তমাখা গামছা, বন্দুক ও কিছু দূরে তার আধ-খাওয়া ক্ষতবিক্ষত শরীর পাই। পরে জানলাম এ হত্যা মানুষখাকী বাঘিনী ও তার পূর্ববয়সী বাচ্চাদের কাজ। সম্ভবত বেচারী শিকারী পায়ের দাগ দেখে চিত্তল হরিণ মারার আশায় ওখানে দাঁড়িয়েছিল। এই সব শিকারীর নির্বিচার জীবহত্যা এখানে বাঘগুলো মানুষখেকো হয়ে উঠেছিল ও গ্রামবাসীদের উপর অত অত্যাচার চালাত। মানুষখেকো বাঘ ও জন্তুজানোয়ার লোভী বাঘ এক গোত্র না হলেও একই জাতীয়। শস্তুশামল বাংলা দেশে তাদের শরীর দীর্ঘে দশফুটের উপর হয় তাই তাদের নাম বাংলার ব্যান্ডরাজ (Royal Bengal Tiger)। বোধহয় বাংলার জলহাওয়ার গুণে তারা দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত বেড়ে ওঠে—যেমন ঝটপুট হলে কেরাগী বড়বাবু ও ধনশালী ভদ্রলোকের মানমর্যাদা বাড়ে।

পাহাড়ে জায়গায় বাঘ শিকারের খোঁজে দূর দূর ঘুরে বেড়ায় ও তাই ওদের দেহ পেশীবহুল হয় ও চটপটে চতুর ও সতর্ক হয়। তাই এগুলো শিকার করাও শক্ত। ব্রহ্মপুত্রের আশেপাশে ও চরে যখন লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায় বা বড় বড় প্রান্তরের বাথান থেকে পালে পালে গরুমোষ চরে বেড়ায়—এই সব জায়গায় ব্যাঘ্রমশায় ভুঁড়িভোজন করে মোটামোটা হয়ে ওঠে। পাহাড়ে জঙ্গলে হরিণ শস্যের সতর্ক হয় ও ক্ষিপ্রগতিতে পালায়, কাজেই বাঘেরাও শিকারের খোঁজে পরিশ্রম করে ও দূরে অগ্ন জায়গায় চলাফেরা করে। বাঘের বিষয় যা বললাম চিতার পক্ষেও এ কথা খাটে। যে কোনও বন ব্যাঘ্র দম্পতির অধিকারে থাকলে অগ্ন পশু আত্মরক্ষায় সাবধান হয়—তাছাড়া অগ্ন বাঘও দেখে শুনে অগ্নত্র চলে যায়—হয়ত এ সব জায়গা চিতা ও বাঘ নিরাপদ ভেবে বেছে নেয়। তোমার হয়ত মনে আছে তিন মাসের মধ্যে একই জায়গায় তিনটি চিতাবাঘ আমার গুলিতে মারা পড়ে।

এদের পুরুষ ও স্ত্রীর প্রভেদ শুধু আয়তনে ও চাতুর্যে। মেয়েরা চতুর হয়, হয়ত অবলা বলে? স্ত্রীজাতিকে খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয়—পুরুষ হলেই মহৎ হবে তার কোন মানে নেই। অলকা, তোমার এ বিষয় ভয় পাবার কারণ নেই, না হয় এটুকু তোমার পতি যে হবে তাকে পড়ে গুলিও না। বাঘিনী সন্তান সম্ভাবনার সময় থেকেই সতর্ক হয়—বাপের কাছ থেকে রক্ষা করা এবং নিজের ও সন্তানদের জন্ত খাবার সংগ্রহ করা বেশ বুদ্ধির দরকার। ব্যাঘ্রমশায় প্রতিপালনে সাহায্য তো করেই না উপরন্তু বাচ্চাদের ঘাড় মটকাতে পারলে বেশী খুশী হয়—তাই বাঘিনীকে দেখতে হয় যতদিন না তারা আত্মরক্ষা করতে পারে। যেমন বাড়ির হলো বেড়াল পারলেই ছানা খেয়ে ফেলে। আমি অনেকদিন ধরে একটি প্রকাণ্ড চিতাবাঘের সন্ধানে ঘুরছিলাম যখন সে তার সাবালক পুত্র হত্যা করল তখনই তাকে খুঁজে পেলাম। ভোরের আলোর আগেই গ্রামের লোক বাঘের গর্জনে জেগে ওঠে ও দেখে গ্রামের এক প্রান্তে উজ্জল চাঁদের আলোয় দুটো মস্ত চিতা খেলা করছিল—হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে বড়টা অগ্নটোর উপর লাফিয়ে পড়ে—কুকুর যেমন ইঁদুর ধরে ঝাঁকড়ানি মেরে ফেলে দেয়—ঠিক সেই রকম করেই ছোটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল—সে নালার জলে পড়ে রইল—বড় বাঘটা আর কোনও খোঁজ করল না। ভোরেই আমি খবর পেলাম—কদিন আগে এর তল্লাশে বেশ হয়রান হয়েছিলাম, এখন খুঁজতে সময় লাগল না। বাচ্চাটা হয়ত মায়ের কাছে আদর কাড়তে গিয়েছিল—বাঘের তা সহ্য হল না।

ভেবো না বাঘ বা চিতা জলে যেতে চায় না তবে নেহাত দরকার না হলে,

পারলে জলের ধারেও ঘেঁষে না। বন্ধুদের কাছে শোনা ও নিজেরও দেখা আসামে সিলেটে অনেক সময় হাতী খেদান না হলেও, বাঘ বেশ বড় খাল সাঁতারে পার হয়েছে। একবার একটি বাঘ মাহতরা দেখল ও অনুসরণ করল কিন্তু সে ধোঁয়ার মতো উবে গেল—সামনে ছোট ছোট ঘাসে ঢাকা মাঠ—চারদিকে হাতীর উপর শিকারীরা বসে—গেল কোথায় সে? পরে খালের মধ্যে মস্ত মাথা দেখা গেল—একটা ঝাউডাল ধরে জলে পড়ে আছে—এই অবস্থায় মহা-রাজার অব্যর্থ গুলিতে মারা পড়ে।

একবার একটা বড় চিতাবাঘ (large panther or leopard-এর প্রভেদ বিশেষ দেখিনে যদিও এ বিষয় অনেকে লিখেছেন) মস্ত ঘন বেত বনে কোনঠাসা হয়েছিল—খালের ধারে একমাত্র পালাবার পথ ছিল—এরই পাশে আমি টুল নিয়ে বসেছিলাম—হাঁকাইয়া বন পিটতে পিটতে এগোচ্ছিল—আমি উৎসুক হয়ে বন্দুক হাতে সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছি, কিন্তু কই কিছুই দৃষ্টিপথে আসেনি—শুধু মনে হল একটিবার জলে ভারী কিছু পড়ার ক্ষীণ আওয়াজ, এত কম যে ভাবতে পারিনি প্রাণের দায়ে চিতাবাঘটি মরিয়া হয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। মন বিস্ময় ও নিরাশায় ভরে গেল, হঠাৎ হাঁকাইদের চিংকার—অনুসরণ করে দেখি বাঘটি অতি সাবধানে জলে সাঁতার দিয়ে এসে চুপিচুপি পালাচ্ছে—কিন্তু চিংকারে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনও দেখেছি যে বাঘ একশ কুড়ি হাত চওড়া খরস্রোতা নদী সাঁতারে পার হয়েছে। নদী পর্যন্ত পায়ের দাগ দেখা গেল ও কুলের কিছু দূরেও ছিল। যখনই পা কাদায় বসে গেছে সে তুলে নিয়ে শক্ত মাটি দেখে নিরাপদ জায়গা খুঁজে এগিয়ে গেছে—একটু জল থেয়ে থেমে আবার চলত। যেখানে গাছের গুঁড়ি পড়েছিল সেদিকে গিয়েছিল—পায়ের দাগ দেখে বোকা গেল, সোজা স্রোতে সাঁতার দিতে কষ্ট হলেও নিরাপদ বুঝে তার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হয়েছিল। এ সব নদীর স্রোত বিশ্বাস করা যায় না তবে ‘হিতোপদেশের’ বাঘ যে পথিকের সাহায্য চেয়েছিল—তার চেয়ে এর বুদ্ধি বেশী ছিল। আরেকটি বাঘ নদীতে সাঁতার দিতে জেলের জালে আটকে ডুবে মরে ছিল—পরদিন জেলেরা চত্ৰবিল থেকে তার মৃতদেহ আমাদের বাড়ি নিয়ে আসে। মাছ ধরতে গিয়ে এ শিকার ধরে জেলেদের লাভ হয়নি মন্দ—খুশিও হয়েছিল সবাই।

তোমাদের মনে আছে—বাড়ির উত্তরে এক মাইলের বেশী লম্বা মস্ত বিল—এখানে সময় মত বুনোহাঁস ও স্নাইপের মেলা বসে—এ বিলটি চলন বিলের শাখা। বিশ বছর আগে বুনোমোষ এ জলায় চরে বেড়াত। একবার দুর্গাপুজোর দিন

কর্তারা ঘরবার করছেন—ব্রাহ্মণেরা ভোজনে বসেছেন, দই, ক্ষীর এসে পৌছয়নি—
যেদিক দিয়ে গয়লারা আসবে সে পথ একপাল বুনোমোষে আটকে রেখেছিল—
যতক্ষণ না নিজেরাই পথ ছাড়ল ততক্ষণ আটকে থাকতে হয়েছিল—মহিষমর্দিনীর
ভোগ চড়াতেও দেরী হল। সে সব জলাভূমি আজ নেই—বিল মাঠ হয়েছে—চাষী
সেখানে ধান চাল লাগায়। বুনোমোষ অতীত চলে গেছে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে
পাহাড়ের দক্ষিণ গরমে, বাঘেরা নালার জলে পড়ে থাকে—সে কথা পরে
হবে।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৭

পায়ের খাবার ছাপ দেখে বাঘ বা বাঘিনী বেশ বোঝা যায়—একথা চিতার
স্বক্ষেপে খাটে। বাঘের খাবার দাগ অনেকটা চৌকন। মুশকিল হয় বড় বাচ্চা
ও বাঘিনীর পায়ের ছাপের বেলায়—তবে সে সমস্তার সমাধান হয় একটি দাগ
থেকে—অতীতের ব্যবধান দেখে—বাচ্চা বাঘের পায়ের ফাঁদ ছোট, বাঘিনীর লম্বা।
এটা লক্ষ্য করা ভাল—অতীতের উপকার হবে ভেবেও। সব জীবজন্তুর পূর্ণ পরিণতি
হতে দেওয়া উচিত—শিশু হত্যা করা ঠিক নয়।

বাঘ ও চিতা কিভাবে গরুমোষ মারে তা জানতে সকলেরই কৌতূহল। আমি
স্বক্ষেপে দেখিনি তবে হত্যা করার পরই সেখানে উপস্থিত হয়েছি এবং বহু গরু-
মোষের ঘাড়ের পাশে পিঠে দাঁতের দাগ দেখেছি। যেভাবে ঘাড় বুঁকে পড়েছে
তাতে বোঝা যায় যে নিরীহ জন্তুর উপর লাফিয়ে পড়ে পায়ের খাবা দিয়ে ঘাড়
মটকেছে। মারার পরই সেটা ঝোপের আড়ালে রাখে যাতে শকুন বা অগ্নি জন্তু
দেখতে না পায়। অতি অনায়াসে এ ভার সরায়—একটা মোষকে এমনি করে তিন
ফুট নালা পার করে রাখতে দেখেছি। এত সহজে এ ভার রেখেছে যে পাড়ের
ধুলোও ঝড়ে পড়েনি। বাঘটি প্রকাণ্ড, তার পায়ের দাগ দেখেই বুঝেছিলাম।
তারপর সে বেড়াল যেমন ছানা মুখে লাফিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি করে অতি সহজে
মোষটা মুখে নিয়ে অক্লেশে নালা পার হয়েছিল।

আমাদের দেশে এ বিষয় লোকেরা খুবই অজ্ঞ। সাধারণত লোকের বিশ্বাস
ফেরিওয়ালার বা ধোঁপার বোঁচকার মতো বাঘ তার শিকার পিঠে করে নিয়ে যায়।
শুনে হাসি পায় যে বাঘ নাকি গরুমোষের লেজ কামড়ে ধরে—দুজনে টানারিঁচড়া।

চলে, চতুর বাঘ হঠাৎ ছেড়ে দেয় তখন মুখ খুবড়ে পড়ে—বাঘ লাফিয়ে ঘাড়ে পড়ে, এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি যদি অল্প কথা বলতে যাও, তারা বলবেন তুমি কিছুই জান না ও এখনও অনেক শিখতে হবে। এর আলুসঙ্গিক গল্প আছে—একবার সুন্দরবনে একটা বাঘ দিনছপুরে আক্রমণ করে, নাপিত ভয় না পেয়ে নরুন দিয়ে বাঘের গলা চিরে দিল—বাঘ পালাবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু নাপিত-ভায়া তার লেজ ধরে আটকে রাখল—লাঙ্গুল ও ছাল তার হাতে রয়ে গেল—বাঘ দিল চম্পট। এ রকম অসম্ভব বীরত্বের কাহিনী আর কখনো হবে না। আমায় এ গল্পটি যিনি বলেন তিনি জার্মানীতে অস্ত্রচিকিৎসায় মারা যান কিন্তু তাঁর গল্প অমর হয়ে রইল।

চিতাবাঘের শিকার অল্পরকম—সে গলায় কামড় দিয়ে ধরে ও যতক্ষণ না মরে ছাড়ে না। লোকে বলে রক্ত শুষে খায় কিন্তু ওটার কোনও প্রমাণ নেই তাই ও-কথা মানা চলে না। চিতার খাণ্ড সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ও বাছবিচার আছে—সে অল্পের মারা জন্তু বা উচ্ছিষ্ট খায় না। আমি একটা মস্ত বাঘকে দেখেছি বাঘিনীর মারা মোষ অধিকার করতে কিন্তু মালিকানী আসতেই তড়িৎ পদে পলায়ন করে। সেই জায়গায়ই শুনেছিলাম একটা বাঘিনী অল্পের শিকার চুরি করে খেত। যখন সে মারা পড়ল, দেখা গেল তার শরীর শীর্ণ—কারণ বুঝতে দেরি লাগল না—তার টাকরায় সজারুর কাঁটা ফুটে চোয়াল ফুটে করে মুখের ভিতর মোচাকের মতো ঘা ছড়িয়ে পড়েছিল—এ অবস্থায় শিকার করে বা কোনও রকমে খাওয়া সাধ্য ছিল না। একজন বড় শিকারী আমায় বলেছিলেন তাঁর মারা বাঘের খাবায় সজারুর মস্ত কাঁটা বেঁধা পেয়েছিলেন।

বাঘ ও চিতা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কত বড় হয় এ নিয়ে মতবৈধ আছে—কারণ মাপবার নিয়ম সকলের এক নয়। বাঘ মারলে তখনই মাপতে হয়—একবার আমার মারা একটা দশ ফুট লম্বা বাঘ তাঁবুতে আনতে তিন-চার ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। তাতে অল্প সঙ্গীরা আমোদ পেলেন কারণ তাঁদের ভাগ্যে শিকার জোটেনি। মৃত্যুর পর শরীর শক্ত হয়ে যায়—ও একবার ছাল ছাড়িয়ে নিলে কিছু বোঝা যায় না। বাঘের ছাল আলাগা বা ঢিলে ঢিলে—ওদের গায়ে ক্ষত হলে সেটা চামড়ায় আটকে থাকে। ছাল ছাড়াবার পর লম্বায় দু’তিন ফুট বেড়ে যায়—চিতার এতটা না হলেও কিছুটা বাড়ে। একই আয়তনের বাঘ বা চিতার ওজন সমান হয়। আমি দেখেছি একটি মজবুত চারপাই মস্ত বাঘের ওজনের চোটে ভেঙে পড়েছে। একটি চিতার ওজন একমন পয়ত্রিশ-ছত্রিশ সেরের মতো আর

বাঘের ছ'সাত মন পর্যন্ত হয়, যদিও সচরাচর এতটা হয় না। ক'বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ল—বাঘের গায়ে গুলি লাগেনি সে হাঁকাইয়াদের মাঝ দিয়ে পালাচ্ছিল, একটা লোক নিরাপদ স্থান না পেয়ে ঝোপের আড়ালে, বসে পড়ে—পলাতক ব্যাঘ্রমশায় দৌড়ে যাবার সময় না দেখেই তার ঘাড়ে হাত রাখেন—তাতেই সে ঘাড় ভেঙে মরে পড়েছিল। তার শরীরে নখের বা দাঁতের চিহ্ন ছিল না।

বাঘের শক্তি ও হিংস্রতায় আর কেউ সমকক্ষ না থাকলেও এরা বুনো কুকুরকে (বুনো কুকুরকে সোনা কুকুরও বলা হয়) খুব ভয় করে। জন্তুদের মধ্যে এদের স্বভাব খুব হীন। এরা যে জঙ্গলে আসে অথবা জন্তু-জানোয়ার ভয়ে অন্যত্র পালায়। বাঘও সেই পথ ধরে কারণ সবাই যখন আতঙ্কে দূরে চলে যায়—বাঘের শিকার করার কিছু থাকে না। ভাল্লুক ও চিতা এদের তত ভয় করে না কারণ এরা সহজে গুহায় আশ্রয় নেয়। আমাদের শিকার একবার এই বুনো-কুকুরের জন্তু মাটি হয়েছিল, বাঘ সাধুর হরিণ যে কোথায় পালাল। বুনোকুকুরের দল খুব চতুর তারা এক জায়গায় না থেকে ছড়িয়ে পড়ে। এক একটা হয়ত পাহাড়ে উঠে ঘেউ ঘেউ করে জানোয়ার তাড়িয়ে দলের দিকে নিয়ে যায়। সাধুর বা হরিণ সহজেই এদের ফাঁদে পড়ে—কারণ তাদের বড় শিং নিয়ে ডালপালার মধ্যে দিয়ে শীগগির পালানো দায়। এই কুকুর এক আধটা মারলেও তারা পালায় না, তবে ঘায়েল করলে তবু ভয় পায়। তবে মানুষকে আক্রমণ করতে কখনও শোনা যায়নি। একজন স্কট্ (Scotch) শিকারী বলেছেন, “এদের মতো বেয়াদব, জঘন্য, খেঁকি জানোয়ার আর নেই!” এ সব কথা অপব্যবহার হয়নি—এমনি একটি কথা ‘de’il’ আদমের (Adam) মুখে প্রথম বেরোয়—রাগটা যে ইভের (Eve) প্রতি ব্যবহার হয়নি, কে জানে? আইন-ব্যবসায়ী বলবেন এই রকম আরেকটি কথা ‘alibi’ (অনুপস্থিতির অজুহাত) এটাও বোধহয় আদমের পাপের মতো পুরাতন—যদিও তাঁর অছিল বিকল হয়েছিল। আমাদের জজেরা যদি তা জানতেন তাহলে তাঁদের হাতে জবরদস্ত উদাহরণ বা নজির থাকত।

একবার একটা চিতা কোথায় যে বেমালুম সরে পড়ল, আমরা ও শিকার অনুসন্ধানকারী সকলেই বেরিয়ে পড়লাম তার খোঁজে। পাশেই অল্প একটু জঙ্গল ছিল—এত কম গাছপালা ঝোপঝাড় যে বেড়ালও লুকোতে পারে না—তাই ওদিকে কেউ লক্ষ্য করেনি—আমরা দু’চারবার আশেপাশে ঘুরলাম, ভাবলাম পাশের ঘন বেতজঙ্গলে আছে, সেখানে খোঁজা উচিত। তখনও কোন দিকে

যাওয়া ঠিক হবে হাঁকাইদের বলা হয়নি, তারা একটু এগোতে না এগোতেই দেখি সেই বাজে অল্প জঙ্গলটায় কিছু নড়ছে—দেখলাম মস্ত চিতা একটা প্রকাণ্ড গোসাপের মতো বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে। বন্দুক আমার কাঁধেই ছিল ভাগ্যিস—শিকারীরা ভাবল আচম্কা আওয়াজ হয়ে গেছে কিন্তু বাঘটার মরার আগে বিকট গর্জন শুনে ও সেটা মরে পড়তে দেখে অবাক হয়ে গেল। চিতাটা কি চুপ করেই ছিল—এত তোলপাড় করে খুঁজেও কারুর চোখে পড়েনি—এটাই খুব আশ্চর্য।

বাঘ শিকারের আরেকটা বিশেষ দিনের কথা বলব—বেশ মজাও হয়েছিল। তোমরা এ গল্প KGB ও আমার কাছে বহুবার শুনেছ। গত মার্চ মাসে এটা ঘটে। বাঘিনী আমার অব্যর্থ এক গুলিতেই মারা পড়ে—সকলেই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার সুন্দর গড়ন ও ডোরাকাটা চামড়ার প্রশংসা করছি, শিকারী হাঁকাইরা সব সেখানেই ছিল—একটা দল পাহাড়ের উপর ছিল অনেকটা দূরে। বাঘিনী মারার খবর তাদের চোঁচিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা মহা আনন্দে দৌড়ে নামছে—আমিও শিকার শেষ ভেবে বন্দুকটি চামড়ার গোলাপে ভরেছি, এমন সময় আমাদের পিছনের ছুটো বড় বড় পাথরের দিক থেকে ‘ঘফ্ ঘফ্’ ছুটো প্রকাণ্ড ভাল্লুকের আওয়াজ কানে এল। KGB তাঁর ‘৫৭৭’ রাইফল নিয়ে দৌড়ে বড়টাকে—হাতের কাছেই ছিল—এক গুলিতেই ধূলিসাৎ করলেন—সে আর টুঁ শব্দও করতে পারেনি। অতটা ঐ গোলমালের স্বেচ্ছা নিয়ে শিকারীদের মাঝখান থেকেই পালাল। আমি বন্দুকটা গোলাপ থেকে বার করার আগেই সব ঘটে গেল।

আর এদিক ওদিকের গল্প না বলে বাঘ ও চিতা শিকারের বিশেষত্ব প্রকৃত ঘটনা থেকে বলব। আবার বলি আমার মতে পায়ে হেঁটে, যতদূর সম্ভব, শিকার করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে শিকারে অপরিণীত ধৈর্য ও অভ্যাস দরকার। অনেক সময় শিকারীর পক্ষে লুকোচুরি খেলার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়—অথবা শিকার খুঁজে বেড়ানোও বিরক্তিকর—তাছাড়া খুব সহজে অতীষ্ট সিদ্ধ হয় না। লম্বা লম্বা ঘাসে এ রকম শিকার চলে না। পাহাড়েই এর সুবিধে ও সুযোগ সম্ভব, ঐ সব জায়গায় বড় বড় জন্তুর নিজের এলাকায় শিকার করাকেই প্রাধান্য দেওয়া চলে। সব রকম হিংস্র স্থাপদ শিকার করতে হলে অশেষ পরিশ্রম ও ধৈর্যের দরকার। এজন্ম শিকারী মানুষকে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দান করতে হয়।

মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ে জঙ্গলে চলাচল সহজ নয় তাই খুব কম শিকারী সেখানে

যায়। শিকারে মরা জন্তু পাহারা দিয়ে বসে থাকা হয়ত তার শেষ প্রচেষ্টা। এই সব জঙ্গলে টোপ ফেলে মাছ ধরার মতো—ছাগল মোষ বেঁধে বাঘকে লোভ দেখানো চলে, যখন ঐ বাঁধা গরু মোষ মারে তখন হয়ত কাছেই কোথাও ঐ হত জানোয়ার খেতে ব্যস্ত দেখা যায়। যে জায়গায় জন্তুটি টেনে নিয়ে গেছে, তার কাছাকাছি যেতে হলে খুব সাবধানতা ও এ বিষয় জ্ঞান থাকা দরকার। কানে কানে কথা বলার মতো কথা বলা, শিকারীর ও হাঁকাইয়াদের গতি ধীর ও মুহূ হওয়া উচিত। গাছের ডালে বসে কাক চিল শকুন উকিঝুঁকি মারে, চতুর শেয়ালেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছন ফিরে দেখতে দেখতে পালায়—ময়ূরের কেকাশ্বর থামে না যতক্ষণ সে বাঘটা দেখতে পায়—এই সব শুনে বোঝা যায়—ব্যাত্রমশায় কোথায় আছেন। প্রত্যেক গাছের আড়ালে, প্রতি পাথরের পিছন ঘুরে যা কিছু আড়াল পাওয়া যায় দেখে তবে এগিয়ে যাওয়া উচিত। লম্বা ঘাসের ধারে বা ঘন জঙ্গলে কখনও চলা উচিত নয়। বাঘের প্রতি ময়ূরের অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। জঙ্গলের আদিম অধিবাসীদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ—তারা ময়ূরের এ দুর্বলতার সুযোগ নেয়—আমি দেখেছি এরা ময়ূরের দলের দিকে এগোচ্ছে সামনে বাঘের ছালের মতো ডোরাকাটা কাপড় ধরে। তাঁবুতে বসে দেখছিলাম ঐ স্বাভাবিক ভীকু পাখীগুলো ঐ ধীর মন্তরগতির দৃশ্যে ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছিল—লোকটি যতই কাছে যাচ্ছিল ওদের উত্তেজনা ততই বাড়ছিল—এক ক্রমেই তারা বিশৃঙ্খলভাবে দৌড়চ্ছিল—তাও কি সুন্দর দেখতে। গৌটিয়া পঁচিশ গজ দূর থেকে তীর ছুঁড়ল—ময়ূরগুলি এদিক ওদিক ঘুরলেও পালিয়ে গেল না। দ্বিতীয় পাখীটি মারার পর ‘বাঘিনী’র আড়াল থেকে মাছুষ বেরোতেই তারা পালাল। এই ছদ্মবেশের নাম ওরা ‘বাঘিনী’ দিয়েছে—হয়ত স্ত্রী জাতীর কৌশল বেশী। যাই হোক এ গল্প বারবার শুনেও বিশ্বাস করিনি। এত সুন্দর পাখী শিকার আমার মতে নির্মম ও নিষ্ঠুর। গৌটিয়ার শিকারের সাফল্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না—সে আমায় বলল ‘বাঘিনী’র কায়দা ও ছদ্মবেশ ওখানের অধিবাসীদের কাছে শেখা—তারা খালি তীর ধলুক দিয়ে ময়ূর শিকার করত, এই ছিল তাদের পেশা।

কোনও কোনও জঙ্গলে হাতী দিয়ে বাঘ তাড়ানো হয়—এ সব জায়গা ছোট ছোট ঝোপ, অল্প অল্প ঘাস, নরম জলা সমতল জমি—স্থানীয় লোক একে ‘ময়দান’ বলে। অবশ্য এসব হাতীকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়—শিকার করার জ্ঞান এ কথা বলা বাহুল্য—তবে এ রকম হাতী পাওয়াও সহজ নয়। হাতীতে সব সময় হাওদা লাগানো হয় না শুধু গদি দড়ি বাঁধা ও পা রাখার জায়গা থাকে—এ তত

স্ববিধের বা নিরাপদ উচ্চাসন নয় বিশেষতঃ যদি ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র মশায়ের সামনে পড়তে হয়—হাতী ভীক হলে তো আরও মুশকিল কারণ সে পালায় ও তখন এগোবার সময় ডালপালা সামলাতে হয়। বাঘ বা চিতা হাতীর ঐ বিরাট বপু হঠাৎ আসছে দেখে স্তম্ভিত হয়ে প্রথম গুলি মারার সুযোগ দেয়। লম্বা লম্বা ঘাস বনে সাঘর হরিণও ঠিক এ রকম ব্যবহার করে। অযোধ্যার জঙ্গলে অনেক চিত্রক হরিণ আছে—সেখানে তারা খুব খেয়েদেয়ে বিশাল ও সুন্দর হয়—হাতীতে চড়ে অনেকবার আমার শিকার খুব ভালো ভাবেই হয়েছে।

হাতীতে চড়ে শিকার করার বিষয় তোমায় বিশেষ সাবধান করে দি—বন্দুকটি যতই ভারী হোক বনে ঢোকান সময় থেকে বেরিয়ে আসা পর্বস্তু নিজের হাতে রাখবে। শিকারের সন্ধানে বেরোলে কখন অতর্কিতে কি সামনে আসবে বলা যায় না—যদি না আসে ভালোই তবু সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। নিজের বন্দুকটি যত ব্যবহার করবে, সময় অসময় হাতে রাখতে ততই সড়গড় হবে—যেমন ক্রিকেট ব্যাট, হকি স্টিক বা টেনিস র‍্যাকেট খেলোয়াড়দের হাতে বসে যায়—খেলার সময় তারা অক্লেশে ব্যবহার করে। Ph. একবার আমার বলা সত্ত্বেও রাইফল না নিয়ে মাচা বাঁধা দেখতে চলে গেলেন। সরু নালার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন, ভূধারে উঁচু পাড় ঝোপঝাড় ঢাকা, হঠাৎ চমকে উঠলেন। প্রকাণ্ড বাঘ কাছ থেকে লাফ দিয়ে নালার পার হয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল। Ph. যখন হাঁটছিলেন হয়ত পায়ে লেগে ছোট হুড়ি গড়িয়ে যায়—সেই শব্দে হয়ত বাঘটা চমকে ওঠে। ভুজনেই সুযোগ হারাল। Ph. কে তোমার মনে আছে হয়ত—Bisley ও নানা জায়গায় তিনি বহু মেডেল পান কিন্তু বেচারী শেষকালে বসন্ত রোগগ্রস্ত একটি ছোট মেয়েকে জলন্ত বাড়ি থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই মারা যান।

এক সন্ধ্যায় ঐ জঙ্গলেই চিতলের খোজে অনেক দূর এগিয়ে ঘন বাঁশবনে এসে পড়েছি। নিস্তব্ধ নিরুন্ম বলে মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকা ও ছোট পাখীর কুহ শোনা যাচ্ছিল। তাছাড়া যেন শূঁচ অরণ্যের অচেনা অজানা স্তব্ধতার শব্দ কানে আসছিল—যেন ঐ বিরল শব্দগুলি ঐ নীরবতা আরও অস্বস্তিকর করে তুলেছিল। চলেছি তো চলেছিই কোথাও গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে, টিপির উপর দিয়ে, মনেও হয়নি কিছু সামনে আসবে—হঠাৎ মনে হল সাবধান হওয়া চাই—যদিও চোখে দেখিনি, কানেও শুনিনি, কিন্তু চেয়ে দেখি বিশ গজ দূরে প্রকাণ্ড হাতী কুলোর মতো কান খাড়া করে ও গুঁড় গুঁটিয়ে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ভাববার সময় ছিল না—পাশের ঘন বাঁশবনে লুকিয়ে পড়লাম। যখন আমায় অনুসরণ করার কোনও শব্দ পেলাম না তখন মুখ ফিরিয়ে দেখি একটি বিরাট হস্তিনী হুঙ্কার করতে করতে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে। আমি যদি দু’তিন গজ আরও এগিয়ে যেতাম ও বাঁশবনে না লুকোতাম তাহলে কি ঘটত কে জানে—তবে সে সময় কি হতে পারত না ভাবাই ভালো। আমার হাতে শুধু টুয়েলভ বোর প্যারাডক্স (12 bore paradox) ছিল। তোমরা জান কত অল্প জায়গায় হাতী অনায়াসে ঘুরতে পারে। এ অবস্থায় শুধু paradox ও আমার দু’পায়ের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রাণরক্ষা করা হয়ত যেত না।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭

হাতীর উপর হাওদায় বসে শিকার রাজার হালে করা যায়—খুব আরামে। হিমালয়ের তেরাই জঙ্গলে, আনামে, শিলেটে হরিণ, মোষ, গুগার, গৌর, বাঘ এমন কি তিতির শিকারেরও এই একমাত্র উপায়। লম্বা লম্বা ঘাস ও শরের যেন সমুদ্র—মাঝে মাঝে হাওদা পর্যন্ত উঁচু ও এত ঘন যে হাতীগুলোও দেখা যায় না। হাতীর পায়ের চাপে ঐ ঘাস ও শরভাঙার শব্দ পিস্তলের মতো মনে হয়। এখানের প্রথম শিকারের দিন আজও মনে আছে যেন বিচালীর গাদায় ছুঁচ খুঁজতে যাওয়া—তফাত এই যে, যে খুঁজতে যায় সে প্রায়ই বিকল হয় না। দোহুল্যমান হাতীর উপর বসে তাক্ ঠিক রাখায় অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। তাছাড়া ঐ দোলার মধ্যে কোন জানোয়ার চলছে সেটা বুঝতে সময় ও অভ্যাস দরকার। কম লোকই হাতী পুষতে পারে—যাঁরা রাখেন তাঁরাও কষ্ট করে শিক্ষা দেন না। এ রকম শিকারের জন্ত কয়েকটা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হাতীর দরকার—কিন্তু সে রকম হাতী পাওয়াও শক্ত—তাদের দামও খুব বেশী। হাওদা শিকারের সাফল্যের জন্ত পঁচিশ ত্রিশটি হাতীর একান্ত প্রয়োজন হয়।

এক সময় বাংলাদেশ অল্প প্রদেশের চেয়ে শিকারে বেশী উন্নতি করে—দেশের জমিদাররা গৌরব মনে করতেন ও আনন্দ পেতেন এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলেছিলেন। কড়া কলপ দেওয়া ‘সার্টি’ ও ‘কলার’ শহীদের মতো অতি কষ্টকর হলেও ব্যবহার করেন। দেশের প্রচলিত খাওয়ার চেয়ে নানারকম ভিন্ দেশীয় খাণ্ড লোভনীয় হয়েছে ও উত্তেজক

পানীয়েৰও অপরিমিত পান চলে। অতি সুন্দৰ ও শ্ৰিং-এৰ চেয়াৰ দেওয়া মোটোৱা পাড়িতে চলাফেৰা কৰেন। এ সব হল জমিদাৰেৰ আধ্যাত্মিক মাপ, তাঁদেৰ শাৰীৰিক মাপ তাঁদেৰ দৰজীৰ কাছে থাকে—সে সব দৰজীদেৰ খুবই কষ্ট কৰে তাঁদেৰ তৰদায়িত বপুৰ মাপে অতি সাবধানে পোশাক তৈৰী কৰতে হয়। একবাৰ এক উচ্চ ৰাজকৰ্মচাৰী জিজ্ঞেস কৰেন, “ৰাজা সিগারেট খাবেন কি?” উত্তৰ এল “আমি শুধু ‘হাভানা’ ব্যৱহাৰ কৰি।” আধুনিকতায় ‘সুৱিয়া ব্যাণিলা’ৰ প্ৰভেদ বুঝতে পাৰা সভ্যতাৰ পৰাকাষ্ঠা ও নানাবিধ মদ্যেৰ প্ৰভেদ জানায় ইংৰিজি বা স্বদেশেৰ সাহিত্যেৰ জ্ঞানেৰ চেয়ে গোঁৱৰ বেশী। কাঁটা চামচেৰ ব্যৱহাৰ খুব নিতুলভাবে শিখেছেন কিন্তু কথাবাৰ্তা ও ব্যৱহাৰে প্ৰকৃত শিক্ষাৰ অভাৱ দেখা যায়। মুগয়া চৰ্চাও কমে অসছে।

যাৱা হাওদা শিকাৰে অভ্যস্ত, তাঁৱা অনেকগুলি বন্দুক গুলি ভৰে তৈৰী ৰাখেন—তাঁদেৰ জানা উচিত এতে অনেক দুৰ্ঘটনা ঘটতে পাৰে। আমাৰ মনে আছে—একটি অল্পবয়স্ক জমিদাৰ যখন হাতীতে চড়ছিলেন তাঁৰ বন্দুকটি গড়িয়ে পড়ে গুলি চলে যায় ও তাৰই আঘাতে তাঁৰ মৃত্যু হয়। অভ্যাস কৰলে বন্দুক বদলাতে যে সময় লাগে তাৰ মধ্যে হাতেৰ বন্দুকে গুলি ভৰা যায়। সাফল্যেৰ জন্তু সৰ্বদা ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰেৰ সঙ্গে নতুনেৰ তুলনা হয় না। সাবধান কৰে দি ঘাস নড়ছে দেখেই বন্দুক ছোঁড়া উচিত নয়—ঘাস থেখানে নড়ে উঠলো জন্তুটি হয়ত অনেকটা সামনে বা পিছনে পড়ে আছে।

দু ভাবে হাওদা শিকাৰ কৰা যায়—যথা লাইন কৰে লটাৰী অনুসাৰে বা কৰ্তা নিজেৰ অভিজ্ঞতা ও মত অনুসাৰে দল সাজান—অৰ্ধচন্দ্ৰাকাৰে এগিয়ে যাওয়া ভালো—পাশেৰ জায়গা শিকাৰীৰ পক্ষে সবচেয়ে সুবিধেৰ। পতাকাৰ সাহায্যে ও সঙ্কেতে লাইন ছড়িয়ে দেওয়া ও সঙ্কীৰ্ণ কৰা হয়। তবে এ উপায়েৰ চেয়ে হাতী দিয়ে তাড়িয়ে দু-একজন শিকাৰীদেৰ দিকে জড় কৰা বেশী ভালো। কিভাবে হাতীৰ লাইন এগিয়ে যাবে, সে বিষয় কৌশল ও অভিজ্ঞতা দৰকাৰ—বাঘ যাতে হাতীৰ লাইনেৰ মধ্যে দিয়ে না পালায়—বাঘ ঘাসে গুঁড়ি মেৰে বসে থাকে ও কিছুক্ষণেৰ জন্তু নিস্তাৰ পায়। সব সময় এ শিকাৰ নিৰ্বিয়ে হয় না। কখনো কখনো হাওদা বাঁধা হাতী দেখবামাত্ৰ বাঘ চাৰ পা তুলে লাফিয়ে আক্ৰমণ কৰে—এ দৃশ্য দেখবাৰ মতো, দেখলে দেবতাৰাও খুশী হবেন। এ সময় হাতীৰ খুব সাহস দৰকাৰ ও গুলিও চালানো উচিত বিপদ এড়াবাৰ জন্তু। এ সময় গুলি লাগুক বা না লাগুক বন্দুক চালাতেই হবে—এমন কি গুলি

ফসকালেও বন্দুকের আওয়াজে বাঘ পালিয়েছে—আক্রমণ না করেই।

গারার (জন্তু মেরেছে) খবর না পেলে বাঘের সন্ধান করা মুশকিল। ঘন লম্বা ঘাসে বাঘ জন্তু মারলেও সে খবর পেতে দু'দিন সময় লাগে। আকাশে শকুন ওড়া দেখে কিংবা তারা মাটিতে নেমেও পালাচ্ছে দেখে বোঝা যায় ব্যাত্র-মশায় কাছেই কোথাও আছেন। অনেক সময় গরু মোষ বেঁধেও কার্যসিদ্ধি হয়েছে। একবার এ রকম করেই একটি বাঘিনী মেরেছি। এ শিকার বিপজ্জনক যখন জলাজমির উপর হাতী চালাতে হয়—তাদের পা ডুবে যাচ্ছে দেখে হাতীর মতো সাহসী জন্তুও আতঙ্কিত হয়। একটা দৃশ্য যেন কাল ঘটেছে বলে মনে হয়—আমাদের প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি হাতী গারো পাহাড়ের চোরাবালিতে পড়ে হিমশিম খাচ্ছিল। আমরা বুনোমোষ ও বারানিশা হরিণ শিকারে গিয়েছিলাম। জায়গাটি মাহতদের পরিচিত কিন্তু এটি ভূমিকম্পের পরের বছর তাই সম্ভবতঃ পাহাড়ের আলগা মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে নীচে এসেছিল—যে জমি সুন্দর সবুজ ঘাসে ঢাকা দেখাচ্ছিল তা কয়েক হাত গভীর চোরাবালি ছাড়া কিছুই নয়। আমরা শরবন জলাজমি থেকে সবেমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি—কুড়ি গজ দূরে শুকনো জমি—হাতীগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় এগোচ্ছিল ও ভয়ে চিৎকার করছিল। হাওদাবাঁধা হাতীগুলোর ছুরবস্থা সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। ঐ দলে একটি শিলেটের হস্তিনী ছিল খুব বুদ্ধিমতি—বড় বড় চাংড়া ঘাস উপড়ে পায়ের তলায় রেখে সকলের আগে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছয়। তার দেখাদেখি অন্য হাতীগুলিও ঐ রকম করে নির্বিঘ্নে পার হল। এতে তাদের যা অক্লান্ত পরিশ্রম হয়েছিল তাতে তারা দু'দিন অকেজো হয়ে পড়েছিল। একটি খাল পার হতে রাজ্য একটি হাতী হারালেন। হস্তিনীটি একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করে কোথায় গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল—শেষ মুহূর্তে মাহত সাঁতার দিয়ে পারে ওঠে।

শিকারীদের খুশীমনে প্রত্যেককে সাহায্য করা, যদি কোনও বিষয় বিবাদ বিসম্বাদ হয় তাহলে শিকারীকর্তার বিচার মেনে নেওয়া উচিত। নিজের গায়া দাবী ছেড়ে দিয়ে শিকারের শান্তি ও সন্তোষ রাখা ঢের ভালো। নির্দিষ্ট জায়গা যাকে যা দেওয়া হয় সেটাই সবচেয়ে ভালো ও সুবিধের ভেবে নিতে হয়—যে সর্বদা অসন্তুষ্ট হয়ে বিড় বিড় করে তারই ক্ষতি। ভাগ্যলক্ষ্মী মূর্ততার প্রশ্রয় দেন না। আমার সামনেই একটা ঘটনা ঘটে। খবর এল একটা প্রকাণ্ড বাঘ বাথানের সবচেয়ে ভালো গরু মেরে নদীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে জল পার হয়ে, ওপারে একটি শিমূল গাছের তলায় উপস্থিত হয়েছে। আমাদের এক সঙ্গীর আগের

দিনের আহত বাঘের সন্ধানে যাচ্ছিলাম—তাই নতুন বাঘের খোঁজ পরের দিন করা যাবে ঠিক হল—যদিও সেদিনই খোঁজা সহজ হত বেশী। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেল—উপরন্তু আরেকটিও আমরা মারলাম। ডাক্তার শেষ বাঘটিকে প্রথম গুলি মারেন কিন্তু S. S. G. (এস্. এস্. জি.-র) চেয়ে বড় বড়ির ব্যবস্থায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই শেষ পর্যন্ত অণুদের উপর চরম গুলি মারার জ্ঞয় ছেড়ে দিতে হত। আমরা আশাতীত সাফল্যের আনন্দে তাঁবুতে ফিরলাম—ও পরের দিন শিকারের জ্ঞয় উৎসুক হয়ে রহিলাম।

গরুর হাড়ের বিষয় বলার মতো কিছু নেই। যা বাকি ছিল তাতে কাকও অতি কষ্টে কোথাও মাংস পেত কিনা সন্দেহ। আমরা উপরে, গোহত্যাকারী বাঘটি নীচে খানায়; সম্ভব অসম্ভব জায়গায় বেলা দুটো অবধি খুঁজেও পেলাম না। কেউ কেউ ছুপুর্বে খেতে চলে গেলেন। তিনটি হাতীও হাঁকাইয়ের দল থেকে কম পড়ে গেল। আমাদের শিকারের কর্তা সময় বুঝা না কাটিয়ে সন্ধান করেছিলেন—তাই আরও একবার খোঁজ করার মতো সময় ছিল। নদীটি যেখানে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরেছে তার তীরেই শর ও ঘাস ঢাকা জমি ছিল—এটি তিন-চরাশো গজ লম্বা ও দেড়শ গজ চওড়া হবে। হুঁধারে জঙ্গল বেশী ছিল না—জায়গাটা বেশ ফাঁকা। বাঘটা অণু পথ নিল তাই হাতীর লাইন নতুন করে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে অণুদিকে চলতে হল। আমি লাইনের শেষে ছিলাম—আমার ডান দিকে খানিকটা খোলা ময়দান ও গরু চরাবার মাঠ ছিল—বঁা দিকে তিন-জন শিকারী বিভিন্ন হাওদায় ছিলেন—তাদের ঐ জায়গাগুলি উত্তম, উত্তমতর, উত্তমতমও বলা চলে—পঞ্চম হাওদাটি নদীর ধারে ছিল। আমি যেখানে ছিলাম দৈব প্রসন্ন না হলে শিকারের আশা ছিল না—সামনে প্রায় আশি গজ জমি—নেড়া ব্রাহ্মণের মাথার মতো—এদিক ওদিক খোঁচা খোঁচা কাঁটা গাছে মাটির অল্পবরতা প্রকাশ হচ্ছিল। নদীর বাঁকে হাতীর লাইন এগোচ্ছিল—বাঘটা যতই কাছে আসছিল তাদের উত্তেজনার আভাস দেখা ও শোনা যাচ্ছিল। হাতীর হুঙ্কার, শুঁড় ও মাথা দোলানো, জমাদারের দড়ির উপর পা লাগিয়ে দাঁড়ানো দেখে মনে হল বাঘটি সোজাপথে আসছিল না—হাতীর লাইনে নিরাপদ জায়গা দেখে পালাবার চেষ্টায় ছিল। হাতীর লাইন দৃঢ় ছিল, এ সুরোোগ ছিল না। আমার সামনের ঘাস নড়ে ওঠায় রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করলাম ও মুহূর্তের মধ্যে ব্যাঙ্গ-মশায় তার সুন্দর গতিতে এগিয়ে এল—তার প্রকাণ্ড মাথা সামনেই দেখলাম। বেশ দূরেই ছিল—তাছাড়া খোলা মাঠের উপর দিয়ে তার আসা অসম্ভব—

আমার দৃষ্টি, মুষ্টি, মস্তিষ্ক সবই ঠিক ছিল—৪৬৫ রাইফল চলল আর বাঘটি অদৃশ্য হয়ে গেল—না তা ঠিক নয়। অল্প ঘাসের ভিতর দিয়ে তার বিরাট শরীরের পার্টিকিলে রোঁওয়া দেখা যাচ্ছিল—নিষ্পন্দ শরীর—জীবনের চিহ্ন ছিল না। মাহতকে বললাম ‘আগে বাড়াও’—দেখলাম ডান চোখের উপর ক্ষতচিহ্ন, নাক মুখ দিয়ে রক্তধারা বইছে—বাঘ নিশ্চল অসাড় পাথরের মতো মরে পড়ে আছে।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

এক সুন্দর চাঁদনী রাতে, জঙ্গলে যখন প্রথম বড় বাঘের সাক্ষাৎকার, সে এতদিনের কথা যে মনে করতেও ইচ্ছে করে না। তখন মাঘ মাস, দেশের বাড়িতেই ছিলাম। ভোরে গ্রামের লোক এসে আমায় খবর দিল যে একটা মস্ত মোষকে বাঘ রাত্রেই গ্রামের শেষ প্রান্তে মেরেছে। দেখা গেল বাঘটা খুব সন্তর্পণে আড়ালে আড়ালে এগিয়ে বেচারী মোষটাকে আক্রমণ করে—কোনও রকম বাদবিসম্বাদের চিহ্নমাত্র ছিল না। বাঘটা অল্পই খেয়েছিল—ও কাছেই চষাজমির উপর তার মস্ত মস্ত খাবার চিহ্ন দেখে বুঝলাম জন্তুটি প্রকাণ্ড। তখন আমার দেহে ও মনে সিংহতুল্য পরাক্রম ছিল—কিন্তু শিকারীদের উপর পিতার কড়া হুকুম ছিল যেন চিতা বা বাঘ শিকারে উৎসাহ না দেয়। তাই হাঁকা করার কথাই ছিল না। কাছেই নিরাপদ গাছে মাচা বাঁধা হল—বেশ কঁচাচ কঁচাচ করছিল। সূর্যাস্তের অনেক আগেই তাতে উঠে বসলাম—সঙ্গে একটি বন্ধু ছিলেন তবে তিনি শিকারী নন ও এ বিষয় কিছুই জানতেন না। সন্ধ্যার আধারের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল শেরা, চোখধলা, ঘাঁঙ্গরের প্রভৃতি বুনোহাঁস সাঁই সাঁই করে মাথার উপর থেকে উড়ে যেতে লাগল—অল্পক্ষণের মধ্যে জঙ্গল নিস্তব্ধতায় ভরে গেল। মাঝে মাঝে শুধু নিশাচর পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছিল। প্রায় পূর্ণিমার ভরা চাঁদ, রাতটি স্ফটিকস্বচ্ছ। একটা বেজী চটপট করে চলে গেল—আরেকটা এদিক ওদিক চেয়ে দেখে মরা জানোয়ারের দিকে গেল, বেশীক্ষণ থামেনি তারা। তারপর দু-একটি শেয়াল এসে তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল—কিন্তু একটা ডাল সেদিকে ছুঁড়ে দিতেই যত শীঘ্র এসেছিল তার চেয়ে শীঘ্র পালাল। অনেকক্ষণ আর কিছুই হল না। রাত প্রায় নটায় দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল, তার কাছেই বস্তিরগুলোও ডেকে

উঠল। এ ডাক থেমে গেল—সব নিস্তর নিঃসাড়—শুধু কাছের শিমুল গাছ থেকে একটা শকুন চিল্লাচ্ছিল। অল্পক্ষণ পর জঙ্গলে, আমাদের দশ গজ দূরে বাঁদিকে জানোয়ারের জোর নিঃশ্বাস ও ঘোঁং ঘোঁং শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত পরই কাঁধের উপর বন্ধুর হাতের স্পর্শ পেলাম। তিনি আমার বাঁয়ে ছিলেন—তার অঙুলের নির্দেশ সত্ত্বেও আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। বাঘটা মাচার ঠিক নীচেই ছিল—বন্ধুটির নিস্তর ও আচ্ছন্ন ভাবে বুঝলাম বাঘের দিকেই তাঁর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। মুহূর্ত মাত্র কিন্তু মনে হল সময় যেন চিরস্থির। বাঘটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে সোজা মৃত মোষটার দিকে এগিয়ে গেল। চাঁদনী রাতে তার স্থায়ী সুন্দর দেহের ডোরা ও গলার ঘন কেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল—তার মন্থর গতিতে চলা এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। নিঃশব্দে বন্ধুটি কাঁধে তুলেছি—বন্ধুটি ঠেললেন—তাঁর দিকে দেখতেই তিনি অজ্ঞের মতো ফুসফুস করে বললেন, “অপেক্ষা কর, খেতে শুরু করুক”—সে মুহূর্তে স্বেযোগ হারালাম—যখন ফিরলাম দেখি ব্যাঘ্রমশায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। প্রতি মুহূর্তে বাঘটা অতৃদিক থেকে বেরোবে ভাবছিলাম কিন্তু মনে হয় মাচার কাঁচাকোঁচ ও বন্ধুর ফিস্-ফিস্ কথায় ভড়কে একেবারে অন্তর্ধান হল—নইলে বাঘটি আমারই হাতে মরত। অনেকক্ষণ ও ক্লান্তিকর অপেক্ষা করেও তার দেখা পেলাম না। এই শিক্ষা হল সে রাতে প্রথম স্বেযোগ এলে তার সদব্যবহার না করে দ্বিতীয়বারের জন্ম অপেক্ষা করা ভুল। সেদিনের দুঃখ আজও স্মৃতিপটে উকিঝুঁকি দেয়।

আজ আমার প্রথম বাঘ মারার কথা বলব। প্রথম বাঘ শিকার শিকারীর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা ও সে আনন্দ উচ্ছ্বাস বুঝতে হলে নিজে অভূতব করতে হয়। সুদূর মধ্যপ্রদেশে রেল স্টেশন থেকে অনেক দূর যেতে হয়েছিল কিছুটা গাড়িতে, তারপর ঘোড়ায় চড়ে ও শেষে হাতীর পিঠে চড়ে পৌছতে হয়। এমনি করে সারাদিন ও রাত কাটল। এই অবিশ্রাম ভ্রমণ শ্রান্তিকর। তবে চাঁদনীরাতে চারদিকের দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর। আমার হাতী জঙ্গলের ছায়া থেকে খোলা জায়গায় এসে আবার গভীর গিরিখাতে যাওয়া পর্যন্ত সমানে নিশাচর পাখীর ডাক পাহাড়ের উপর থেকে শোনা যাচ্ছিল। যখন পৌছলাম পূর্বের আলোয় আকাশ রাঙা রঙে রাঙিয়ে এসেছে। তাঁবুতে খড়ের বিছানায় গুটিপোকার মতো গুটিয়ে শ্রান্ত দেহ এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। শিকারের ভালো খবর এসেছে তাই নিমন্ত্রণকর্তা শীঘ্র বিনা আড়ম্বরে ঘুম ভাঙলেন। শিকারের বিষয় সব জেনে নেওয়া দরকার—তাহলে পরের দিন শিকার ভালো হবে। বেলা দশটা আন্দাজ

বৈশাখের খররৌদ্রতাপে আমরা গরুর গাড়িতে কাঁকানি খেতে খেতে চললাম। বেশী হাঁটার জন্ত বলদগুলোও শ্রান্ত হয় তাই বলদ বদলাতে দাঁড়লাম। দীর্ঘ শ্রান্তিময় দিনেরও শেষ হয়, রাতটা বেশ আরামদায়ক। আমাদের সঙ্গে দশ বারটা বুড়ো বলদ ছিল—‘গারা’ বাঁধার জন্ত। মারাঠারা বাঙালীর গরু-ভেড়া-ছাগল বেধে লোভ দেখানোর কুসংস্কার মানে না। গরুর গাড়িতে যেতে যা কাঁকানি খেলাম হাড়ে মাংসে তা জানান দিল। মাঝরাতে রুঢ় প্রচণ্ড ধাক্কায় গাড়ির বাইরে ছিটকে পড়লাম—ঘুম ভেঙে গেল—গাড়িটা উন্টে খাদে পড়ে। পিছনে দুটো বলদ বাঁধা ছিল। বাঘ তাই অহুসরণ করছিল ও স্বেযোগ বুঝে আক্রমণ করে। বলদ ভয় পেয়ে টেনে দৌড়য়—চারদিকে হৈ-হল্লা শুরু হয়। আমার নাক থেকে অল্প রক্ত পাত হয়। তাছাড়া আর কিছু অঘটন ঘটেনি। সবগুলি বলদ শান্ত করতে সময় লাগল—পুনঃযাত্রা শুরু করলাম। স্বর্ষোদয়ের একটু পরেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছলাম—আর কোনও বাধাবিপত্তি হয়নি। শিকারী উৎসুক হয়েই খবর দিল ‘গারা’ হয়েছে, বেশী দূরেও নয়। ‘হাঁকা’ প্রাতরাশের আগেই করবে, না পরে? আগেই শুরু করা যাক—সৌভাগ্য আছে কিনা জানার জন্য যেন আমার ধৈর্য ছিল না। তাছাড়া মারাঠী প্রাতরাশে অনভ্যস্ত জিহ্বার দূরে যতক্ষণ পারা যায় রাখাই শ্রেয়।

হাঁকাইয়ারা জড় হয়েছিল—কোথায় কোন বন্দুকধারীকে দাঁড়াতে হবে তা ঠিক হয়েছিল। তাই সকলের শিকারে বেরোতে দেরী লাগল না। আমাদের মাত্র দুজনের হাতে বন্দুক ছিল—শিকারের কর্তার ও আমার। তবে নানারকম লোকের নানা রকম বন্দুক ও অস্ত্র ছিল—বীভৎসহলেও প্রত্যেকটা আলাদা। এইসব লোক তরতর করে গাছে চড়ে বন্দুক ছুঁড়ে বা অত্ন শব্দ করে বাঘটাকে অত্ন পথে না যেতে দেবার জন্ত তৎপর হয়ে রইল। আমি মাচায় না বসে মাটিতেই বেশ ভালো জায়গা বেছে নিয়েছিলাম। আমার সামনে উত্তরদিক থেকে দক্ষিণ অবধি সঙ্কীর্ণ ছোট গাছের জঙ্গল ছিল। পঞ্চাশ গজ অবধি হাঁকাইয়াদের এগিয়ে আসা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ছোট ঘন সবুজ গাছের জঙ্গল ছিল, দরকার বুঝে বাঘ এখানে বেশ লুকোতে পারত। হাঁকার গোলমাল শীঘ্রই শোনা গেল। একটা দাঁড়কাক উড়ে কাছের পলাশ গাছে বসে নীচে কাউকে গাল দিতে লাগল, বারবার ঘুরে বসছিল। একটা গাছের পিছন থেকে ডালপালার আড়ালের মধ্যে দিয়ে একেবেঁকে ধীর গতিতে বাঘ এগিয়ে আসছে দেখলাম। অনেক দূরে ছিল—পরে দেখলাম এটি বাঘিনী। পিঠ নীচু করে চলেছে, বেশ সহজে ও অক্লেশে কাঁধের উপর গুলি করতেই ভ্রমিড়ি খেয়ে পড়ল কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে মাতালের মতো টলতে টলতে চলল,

ছোটো গাছের ফাঁক দিয়ে দ্বিতীয় গুলি চালানাম। পড়ে যাওয়া সঙ্গেও আর উঠতে না পেরে গর্জাতে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম, এ গাছের ও গাছের পিছন থেকে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়ানাম—আর এগুনো নিরাপদ হত না। ছুদিকে শাখা গেছে—তার উপর বন্দুক রেখে দাঁড়ানাম। গুলি করার আগেই বাঘিনী কি করে বুঝল আমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। তবে তার নড়ার শক্তি ছিল না—শেষ গুলিতে মরে পড়ে গেল। সেদিনের সাফল্যে আনন্দ সমানভাবে আজও আমার উচ্ছ্বসিত করে। একটা কথা বলি—বাঘিনীর আমার দিকে আসার ঐ একমাত্র পথ ছিল।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

বাঘের গল্প এখনও বলা শেষ হয়নি, হবেও না, নেহাত যদি অতি বৃদ্ধ বা স্থবির না হয়ে পড়ি। তোমাদের কাছে এ সব কথা কখনও নীরস লাগে না। অনেকবার শিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমীর খাঁর বিষয় বলতে শুনেছি। বড় বড় কর্মচারী ও পুলিশ অফিসারদের মধ্যে তার নামডাক ছিল। বাঘ, বাইসন বা গৌর এ সবের অহুসরণ করে খোঁজ দেওয়ার ঝোঁক ছিল অসম্ভব। এজ্ঞে খুশী হয়ে তাঁরা তাকে ‘জাগিরদার’ করেছিলেন। ১৯০২ সালে যখন আমি তাকে প্রথম দেখি সে বুড়ে হয়ে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে, তাই তার উৎসাহ ও উত্তম কমে। প্রতিদিন ভোর চারটের সময় আমার তাঁবুতে এসে অল্প অল্প কেশে আমার ঘুম ভাঙাত। তারপর সমীর খাঁ, একজন গোণ্ড ও আমি বন্দুক ঘাড়ে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে গারা বাঁধা হয়েছে সেগুলি সব দেখে আসতাম। এ কাজ খুব নিরাপদ নয়। ভোরেই সব জন্তুজানোয়ার, বাঘ ভাল্লুক সাঘর নিজেদের গুহায় ফিরে আসে। তখন তাদের মুখোমুখি না হওয়াই ভালো—তবে সেজন্তু সমীর খাঁর মতো পথপ্রদর্শক দরকার। হরিণ যখন ঘাসের উপর চলে বা ভাল্লুকের থপ থপ চলার শব্দ ছোটোরই বেশ তফাত বোঝা যায়, আর বাঘের নিঃশব্দ ধীর মন্তরগতি নিভুল বুঝতে পারি। এ রকম ধীর পদক্ষেপ শুধু বেড়াল জাতীয় জন্তুর মধ্যে দেখা যায়। সমীর খাঁ পাহাড়ে ঘাসবনের ভিতর দিয়ে চলার সময় ফিস্‌ফিস্‌ করে বা বলার বলত, তবে নেহাত ছোট জন্তু দেখলে পাশ কাটিয়ে যেত ও তাদের যা-তা বকত। আমরা

জানোয়ার আনাগোনার পথ ছেড়ে দূর থেকেই বাঁধা ‘গারা’ কি অবস্থায় আছে দেখে আসতাম। তবে সন্ধ্যাবেলার আলোয় এ জন্তুগুলি শুয়ে থাকলে বা বসে থাকলে কিংবা বাঘ মেরে রাখলে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যেত না। আমরা সতর্কভাবেই চলতাম। কখনও গাছের আড়ালে বা বড় পাথরের পিছনে, কান খাড়া করে পশুপাখীর ডাক শুনে সাবধানে এগিয়ে যেতাম। সেদিন অপরাহ্নে মছয়া কুড়োতে গিয়ে একটি স্ত্রীলোক বাঘ নদীতে জল খাচ্ছে দেখে দৌড়ে আমাদের খবর দিতে এসেছিল। শুনেই ‘গারা’ বাঁধতে লোক ছুটল। ব্যাব্রমশায়কে লোভ দেখিয়ে সে পথে আনার ইচ্ছেয়। সেখানে নালাটায় নামতে বা চড়তে খুব খাড়াই পথে যেতে হয়। বাঘটি এ সব কষ্টকর পথ লঙ্ঘন করে জানোয়ারটি মেরে বেশ অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সমীর খা নালায় ধার দিয়েই যেতে চাইছিল কিন্তু আমি খার অতিথি তিনি সঙ্গে ছিলেন না বলে তাঁবুতে ফিরে এলাম। মছয়া গাছে ময়ূরের কেকা শোনা গেল। প্রথমবারের হাঁকাতে বাঘটা হাঁকাইদের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছিল। হাঁকার শব্দ ছিল না। সমীর খা সব কথা বলে আমাদের নতুন জায়গায় বসাল। জঙ্গলের পোড়া ঘাসের ছাইয়ের উপর বাঘের থাবার দাগও দেখাল। আমার নিমন্ত্রণকর্তা ভালো জায়গা বেছে গাছের উপর বসলেন। আমি নালায় কাছে একটি গাছের তলায় বসলাম। কোনোরকম শব্দ না করে হাঁকাইরা চলতে শুরু করল। মাঝে মাঝে কুড়ুল দিয়ে গাছ বা পাথরে মারার ঠকঠক শব্দ শোনা যেত। দুটি লোক গাছে চড়েছিল, সে পথে যদি বাঘ আসে তাদের কোনো রকম সঙ্কেতে জানাতে বলেছিলাম। তাদের একজন পাগড়ী খুলে নাড়িয়ে আমায় বোঝাল বাঘ কোন্ দিকে চলেছে। দেখলাম বাঘ মাথা নীচু করে চলেছে, তার সামনের ও পিছনের ঘাস ছলছে। আমি মাথায় গুলি মারার পক্ষপাতী নই কারণ বাঘের মাথার পিছন দিকে ফিলু থাকে। আর গুলি সেখানে লাগাতে হলে বিশেষ কোন্ দিকে গুলি করতে হবে বুঝতে হয়। বাঘটা ক্রমেই কাছে আসছিল। ত্রিশ গজ, বিশ গজ, দশ গজ, তবু ঠিক জুতসই হচ্ছিল না। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। যখন সে ঘাসের বাইরে এসে নালায় নামতে শুরু করল—আমি ঘাড়ের উপর গলার কাছে গুলি করলাম। লাফিয়ে উঠে সেই নালায় ছমড়ি খেয়ে পড়ল। কুকুরের মতো বসে দু’দিকেই মাথা নাড়াতে লাগল। নাক মুখ থেকে রক্ত বয়ে গেল। এক গুলিতেই তার চলৎশক্তিরহিত হয় ও দ্বিতীয় গুলিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। মনে হল হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমচ্ছে। আমার নিমন্ত্রণকর্তার শিকারী কিছু ক্ষুধা হল যে তার মালিক বাঘটি মারতে পারলেন না। এ নিয়ে সমীর খার

সঙ্গে তার কিছু বচসা হয়। সে বলে, “বাঘ কি গরুর মতো লেজমোড়া দিয়ে তাড়িয়ে আনা যায়।” এই কথা শুনে মনে মনে হাসলাম।

পরদিন ঐ নালার কাছে শুকনো নদীর কোলে আরেকটা মস্ত বাঘ মারলাম। কর্তা সবচেয়ে ভালো জায়গা বেছে বসলেন। সমীর খাঁর এটা পছন্দ হল না। নালার উপর একটা গাছ এসে পড়েছে দেখে একটি লোক সেখানে বসিয়ে রাখল। তার সামান্য সঙ্কেতে বাঘ আমার দিকে ঘুরে এগিয়ে এল। ঘাসের উপর প্রকাণ্ড সুন্দর স্তূঠাম দেহ দেখতে পেলাম। সে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। পিছনে পাহাড় জঙ্গল নদী, তার সামনে বাঘের চমৎকার দাঁড়াবার ভঙ্গি ছবির মতো দেখাচ্ছিল। সে কিছুক্ষণ দেখে শুনে আরও খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল তার সাদা বুক ফুলিয়ে। কুড়ি গজ দূরে, হাতের টিপ ভুল হবার নয়। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সে পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুক কামড়াবার চেষ্টা করছিল। দ্বিতীয় গুলি খুব তাড়াতাড়ি মারি। তাতেই সে মরে পড়ে রইল। সন্ধ্যায় সমীর খাঁ তার কর্মদক্ষতার কথা চুপিচুপি বলেছিল। সবই তার ন্যায়সঙ্গত কাজ।

২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সীমানায় আমার জানা জায়গায় তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি বাঘ অনেকগুলি নরনারী হত্যা করেছে খবর পেলাম। পাহাড়ে জঙ্গলে ভয়ে গ্রামবাসীরা কাঠকুটে। কুড়িয়ে আনা ও ফল কুড়ানো বন্ধ করেছে। বাঘ কয়েকটি সুবিধেজনক জায়গা বেছে নিয়েছিল। যে পথে গরুর গাড়ি ঘুরে আসে সেখানেই সে লুকিয়ে থেকে আরও কিছু লোকজন মেরেছিল। এটি বাঘিনী হলেও শিকারে বেশ পটু। বহু গরু ভেড়া ছাগল খেয়ে গ্রামটি উজাড় করেছিল। স্থানীয় এক শিকারী তাকে মারার সুযোগ পায়, বাঘিনী যখন মারা গরু খেতে আসে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল কিন্তু তার কাতুঁজ না ফোটার জন্যে গুলি বেরোয়নি। কিন্তু ঘোড়া পড়বার ঐ শব্দটুকুতেই বাঘিনী চমকে যে পালাল, পরে আর ওরকম প্রলোভনের সামনে আসেনি।

আমরা কাজের শিকলে বাঁধা, স্বাধীনভাবে সব সময় সব জায়গায় যেতে পারি

না। আমি তাও মফস্বলে কাজের সঙ্গে শিকারের স্বযোগ নিয়েছি—অশেষ ধৈর্য ও অধ্যবসায়। পয়সা রোজগার হয়েছে, খরচাও কম হয়নি, তাও দু'চারটে চিতাবাঘ মেরে কোলায় ভরে এনেছি। একজন জঙ্গ মজা করে বলেন আমার ছুটি শিকার জোটে—মক্কেল ও বাঘ। এ ছুটিই যেন আমার পুরোনো রোগের মতো পেয়ে বসেছে। যখন প্রথম ব্যারিস্টারী শুরু করি দু'একজন শুভানুধ্যায়ী মক্কেলদের বোঝাবার চেষ্টা করেন যে আমার বিদ্যাবুদ্ধি আইনের চেয়ে শিকারেই বেশী। তবে শিকারী ও খেলোয়াড়ের প্রতি ইংরেজের পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী। ছুটির ব্যাপারে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভালো। মুসলমান পরবের মত চাঁদ দেখতে হয় না। সেবার দোলে বেশ ক'দিন ছুটি পাওয়া গিয়েছিল। তবে অল্পদিনের ছুটিতে কাছাকাছি যেখানেই যাই, কাজের ফাঁস টানতে থাকে। হাতে যে আপিলটি ছিল সেটা প্রায় শেষ দশা হয়েছিল—জজকে বোঝালাম, সকলের একান্ত অহরোধে এটি পেশ করা—স্ববিচারের অভিপ্রায়ে যত শীঘ্র শেষ করা যায় ততই ভালো—আমরাও অল্প ভালো কাজে লাগতে পারি।

শিকারে যাবার জন্ত KGB গন্তব্যপথে পড়ে এমন একটি স্টেশনে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। মাঝরাতে আমরা পোর্টলাপু'টলী নিয়ে নামতেই পুলিশ অফিসাররা থানায় নিয়ে গেলেন। সেই একমাত্র রাত আমরা এহেন নিরাপদ জায়গায় কাটাই। সেখানে পৌছবার পর একজন হাসতে হাসতে বললেন আমরা কোথায় এসেছি—বারান্দায় পর্যন্ত মোটা গরাদ দেওয়া—দেখে শুনে বন্ধুবরের হাসির ফোয়ারা ছুটল—হাসি আর থামে না, যেন হিষ্টিরিয়া হল। আমি বললাম, “পাথরের পাঁচিল থাকলেই কারাগার হয় না বা গরাদ হলেই খাঁচা হয় না—” আমাদের নির্দোষ শান্তিময় মন—তাই এটা আশ্রম বলে মনে করে নিয়েছিলাম।

ভোর হতেই আধুনিক যানবাহন ও সুন্দর রাজপথে আমাদের যাত্রা শুরু হল। কিছুক্ষণ একজন পুলিশ আমাদের ভার নিল। সে অনেকদূর থেকে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে। এদের হাত এড়ানো মুশকিল তবু মনে হল আবার কোনও দিন যদি এদিকে আসি এরকম স্বব্যবস্থার সৌভাগ্য যেন হয়।

তারপর হাতী চড়ে কয়েক মাইল পর শিবিরে পৌছলাম। লোকজন জড় করে শিকারের খবরের জন্ত চারদিকে পাঠানো হল। এ জায়গাটি এত সুন্দর ও মনোরম—চারদিক পাহাড়ে ঘেরা—স্বিচ্ছ বনে সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে মাছরের ডাক যেন সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টার মতো বাজছিল। বাঘিনীর যে খবর পেলাম সেটা পাঁচ-ছ দিন আগের। বন্ধু তাই বিমর্ষ হলেন। আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। ভাগ্য-

লক্ষ্মীর প্রসন্নতায় আমরাও খুশী হয়ে উঠলাম। সকালেই খবর এল স্বর্ঘ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক কাঠ কুড়োতে যাচ্ছিল, বাঘিনী তাকে ধরার চেষ্টা করে। তবে দৈবযোগে সে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে বাঘিনী নালার দিয়ে অগ্র পথে যায়। নালার পাশে তার পায়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দিনে যেখানে সে লুকিয়ে থাকে সে পথে তার পায়ের চাপে ঝরে-পড়া বালি ও কাদায় থাবার দাগ দেখা যাচ্ছিল। নালার পাড়ে সে লাফিয়ে পাহাড়ে চড়েছে, সেখানে অনুসরণ করা একটু কঠিন হচ্ছিল। কোথাও পাথর গড়িয়ে পড়েছে, কোথাও ঘাস, কচিপাতা মুষড়ে পড়েছে তার পায়ের চাপে—এইসব দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে চলতে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল নিশ্চিত না হয়ে এগিয়ে যাওয়া ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা নালার দিকে ফিরে চললাম। এই দিনের এত আলোয় পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাঘিনী বেশী দূর যাবে না বলেই স্থির নিশ্চিত মনে হল। নালার কাছে তিনটি ঘাট ছিল ও একজনই বন্দুক হাতে তিন দিক পাহারা দিতে পারে।

আধমাইল দূর থেকে বাঘ হাঁকানোর ব্যবস্থা করা হল। আমি আট ফুট উঁচু পাথরের উপর উঠে মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম যেখানে বসে তিনটি ঘাটই আমি যেন দেখতে পাই। আমার সামনে ডানদিকে ছোট ছোট পাথরের ঢিবি ও গাছ ছিল। তার ভিতর দিয়ে ঘাটের সরু সরু পথ এঁকেবেঁকে গেছে। আমি যে পাথরের উপর বসেছিলাম তার কাছে ছোট ছোট গাছ ছিল, তার ছ'চারটি ডাল টেনে নামিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিলাম যাতে দেখার বা বন্দুক চালাবার অসুবিধে না হয়। কতটুকুতে যে আড়াল হয় সহজে বিশ্বাস হয় না। শিকার পাশ দিয়ে নিঃসন্দেহে চলে যায়, মানুষের গন্ধ পায় ঠিকই। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে গন্ধও কমে আসে। চূপচাপ যদি বসে থাকতে পার জন্তুজানোয়ার তোমার দিকে আক্কেপও করবে না। হিংস্র জন্তু খুব কাছ ও পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির থাকা মনোবলের দরকার, তবে অভিজ্ঞতাও অভ্যাসের সঙ্গে মন ও দেহ ইম্পাতের মতো দৃঢ় হয়ে ওঠে। আমার জায়গা থেকে গুলি চালানো বিপজ্জনক মনে হল, ঐ সব ছোট রাস্তাগুলো নালার দিকে নেমে গেছে। KGBকে একটা ছোট চারপাই দিয়ে মাচা করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে একজন গৌটিয়াও নিজের জায়গা করে নিল। তার গাছে চড়ার ক্ষমতা অদ্ভুত। স্থানটি আমাদের যতই কম ও কষ্টকর মনে হলেও দেখতাম সে অনায়াসে বেশ সুরিধে মতো জায়গা করে আরামেই বসে যেত—বন্দুক ছুঁড়তেও সে বেশ ওস্তাদ ছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর হাঁকাইদের হৈ-হল্লা শুনলাম। আরও কিছু পরে পাহাড়ের উপর তাদের দেখলাম। পরমুহূর্তে দেখলাম মস্ত বাঘিনী তুলকি চালে আসছে ঘাটের মাঝখান দিয়ে। পাথরের আড়ালে একটুক্কণের জন্য গিয়েছিল তারপরই তার মাথা ও ঘাড় দেখতে পেলাম ও কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। বন্দুক তুলতে যে সামান্য নড়াচড়া হয় তাতেই সে আমার দিকে ঘাড় ফেরায়। গুলি কানের ভিতর দিয়ে ঘাড়ে লাগল ও তখুনি সে ধূলায় পড়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি মারার জন্য প্রস্তুত হলাম কিন্তু নড়াচড়া নেই দেখে বন্দুকের যে নলটি খালি হয়েছিল সেটাতে আরেকটা গুলি ভরে অপেক্ষা করে রইলাম। শিকারীরা কয়েকজন পাহাড় থেকে নেমে আমার ডানদিকে ও সামনে কিছুদূরে সতর্ক হয়ে দাঁড়াল। বিজয়ের আনন্দে আর স্থির থাকতে পারলাম না। সন্ধ্যের বাঁশিটি বাজলাম, KGB ও গৌটিয়া কাছেই ছিল, আনন্দে কোলাহল করে কাছে এসে সবাই বাঘিনীকে ঘিরে তার সুন্দর শরীর ও রঙ দেখে প্রশংসা করতে লাগল। পাহাড়ের উপর থেকে সকলে সময় মতো এসে পড়তে না পেরে ব্যস্ত হয়ে উঠছিল। এখানেই ছুটি ভাল্লুকের দেখা পাই সে কথা আগেই বলেছি। সময় নষ্ট না করে তারা একটি খাটিয়ায় বাঘিনী ও আরেকটিতে ভাল্লুকটির শয্যা রচনা করে বাহকরা মহা সমারোহে নিয়ে চলল। আমি ও KGB হাতীতেই চড়লাম—গৌটিয়া গজেন্দ্রের লেজ ধরে প্রায় বুলতে বুলতে চলল। পথে গ্রামবাসীরা হরিণের শিঙের উপর তৈরী ঢাকঢোল মহা উল্লাসে বাজিয়ে নেচে নেচে চলল। কাছে গিয়ে দেখলাম বাঘিনী ক্রুশ হলেও চামড়াটি অতি সুন্দর। আমাদের হোলির উৎসব নরখাদক বাঘিনীর রক্তে সমাধা হল।

শীঘ্রই আমরা এ শুভসংবাদ বিশ মাইল দূরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তার কাছে আর তোমাদের ও বন্ধুবান্ধবের কাছে পাঠালাম। এদের সকলের কাছেই আমরা আন্তরিক অভিবাদন পেয়েছিলাম।

শিকারে এমন সুন্দর চামড়া লাভ হলে সেটা ভালো করে রাখাও উচিত—বিশেষ যত্নও দরকার। আমি লগুনে প্রসিদ্ধ ‘Rowland Ward’-এ পাঠালাম, প্রত্যেকবার এই চর্মশোধনকারীরা চমৎকার কোশলে চামড়াগুলি তৈরী করে পার্শেল পাঠিয়েছে—এবার অনেকদিন খবর পাইনি। কদিন আগে খবর এল শত্রুর বিরুদ্ধ আচরণে পার্শেলটি হারিয়েছে—এ সময় ইংরাজ ও জার্মানের যুদ্ধ চলছিল—জুথের সঙ্গে এ ক্ষতি মানতে হল—বিজয়ের আনন্দ শোকপূর্ণ হল। হুণ্ পাশবতা এর প্রধান কারণ।

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

আহত হিংস্র জন্তু—বাঘ, ভাল্লুক, চিতা অহুসরণ করা বিপজ্জনক ও নির্বিঘ্নে করতে হলে, নিজেকে ও তোমার সাহায্যকারী অহুচরদের জন্ত বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার ও অশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। অহুচরদের রক্ষার কথায় বেশী মনোযোগ দেওয়া দরকার কারণ তোমার কাছে আত্মরক্ষার যে অস্ত্র আছে—তাদের কাছে নেই—তাদের জীবনরক্ষার ভার সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করে। শিকারে দৈবাৎ বিপদ ঘটে না—যা ঘটে সবই নিবুদ্ভিতা, অজ্ঞতা ও চরম দুঃসাহসিকতার জন্ত। এতদিনে আমার চিঠিগুলো পড়ে তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ যে হিংস্রজন্তু শিকার করতে সুবিচার করে যেখানে দাঁড়াবে সে স্থানটি ঠিক করে নেওয়া প্রধান, অনর্থক বিপদ ডেকে আনা কিছু নয়। বন্দুকের শব্দ হলেই, সকলে যেন স্থির থাকে ও কোনও শব্দ না করে এ বিষয় কড়া হুকুম দেবে—ও এ হুকুম যেন বিশেষভাবে মেনে চলে সে বিষয় মনোযোগ দিয়ে দেখবে। আমার বাঁশীর সংক্ষেপে তারা বুঝতে পারে শিকারে গুলি লেগেছে কি লাগেনি বা ঘায়েল হয়ে চলে গেছে। সোরগোল না হলে আহত জন্তু বেশী দূর যায় না; কাছেই আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে সে প্রাণপণে যতদূর সম্ভব ততদূরে যেতে চেষ্টা করে। সম্ভবত ও সাধারণত সে দৃষ্টির কাছেই থাকে তবে শেষ গুলি মারার সুবিধে হয় না। এজন্যই স্থির না থাকা বা কথা বলা তোমার সাফল্যের বা তোমার জীবনের পক্ষেও হানিকর।^১ তোমার যদি বন্দুক বাহকের দরকার থাকে তাকেও এ শিক্ষা দেবে।

এ বিষয় তোমায় বিশদভাবে বলছি—একবার একটা মস্ত চিতাবাঘ লাফিয়ে বন থেকে বেরোতেই গুলি করি—আমার দিকে পিঠ করে ছুঁচার পা-র মধ্যে পড়েছিল। কাছেই চারদিকে বাবলাগাছ ছিল, বাঘ বড়জোর এক ফুট উঁচু কুড়ি গজ দূরে যেতে পারলে তবেই সে লুকোবার আশ্রয় পেত, আমার ও তার মধ্যে আড়াল বিশেষ ছিল না। সে বেশ আমায় আক্রমণ করতে পারত। শরীর টান করে রেখেছিল, ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল ও কান খাড়া করে লেজটি সামান্য নাড়ছিল। মনে হল একটার চেয়ে দুটো গুলিতেই কাজ সারব। সর্বক্ষণ তার উপর চোখ রেখে (যতটা ভাবা যায় তত সহজ এ কাজ নয়) বন্দুকের ডান

নলে গুলি ভরছি এমন সময় আমার পিছনেই গাছের উপর থেকে একজন শিকারী হঠাৎ বলে উঠল, “এই উঠল, গুলি কর, গুলি কর।” আমার চেয়ে সে হয়ত বাঘের ছুরভিসন্ধি বেশী বুঝতে পেরেছিল। এ অবস্থায় যে পড়েছে সে-ই বুঝবে কি সাংঘাতিক আক্রোশে চিতা উঠে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। বন্দুক নামিয়ে গুলি করতেই সে পড়ে গেল। তখন আমিও নিশ্চিত হলাম তবে একেবারে দ্বিগুণ নিশ্চয়তার জ্ঞান অল্প নলের গুলিও তার উপর লাগলাম। তার আক্রমণের সময় ভীষণ ও ভয়ঙ্কর গর্জন একশো গজের বেশী দূরে শোনা গিয়েছিল। বিপিন না চোঁচালে আমি অক্ৰোশে তাকে আগেই মারতে পারতাম ও অল্প গুলিটি অসময়ের জ্ঞান থাকত। বেচারী বিপিন বেজায় হুঃখিত হয়েছিল। এ শিক্ষা হবার পর ভবিষ্যতে কখনও এরকম করেনি।

বাঘ বা চিতা নীচু হয়ে গুয়ে থাকলে যতই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হোক তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। জায়গা তার নিজের মনের মতো একথা মনে রেখে তোমায় তাকে খুঁজে বার করতে হবে। দলে ভারী হলেও রক্তের দাগ ও পায়ের চিহ্ন দেখে আহত জন্তু অনুসরণ করতে বলব না। বন্দুকঘাড়ে দলবদ্ধভাবে এ কাজে অগ্রসর হয়ে বিপদ ঘটতে শুনেছি। তখন তার মনে হয় ‘আমায় একা ছাড়লে বাঁচি।’ কোন দিক থেকে জন্তুটা আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। যদি নিঃশব্দে ও কথাবার্তা না বলে থাক, তাহলে বেশীর ভাগ সময় দেখবে অহত জন্তু কাছেই আশ্রয় নিয়েছে। হয় মরে গেছে নয় খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। তখন নিশ্চিত এগিয়ে যেতে পারবে। আমি প্রথমে শিকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করি, তারপর বড় বৃত্ত করে ঘোরা পথ ধরে তাদের অনুসরণ করতে বলি ও ক্রমশ সেটা ছোট করে আনি ও তারা নজর করে দেখে জন্তুটি কতদূর গেছে। বেত বনে যদি লুকিয়ে থাকে তাহলে দু-একটা হাতী থাকলে সহজে বন পিটিয়ে তাকে বাইরে আনা যায়। তা না হলে লম্বা লম্বা বাঁশ হাতে দলবদ্ধ হয়ে শিকারীরা বন পেটায়। পাহাড়ে জঙ্গলে মোষের দল পাঠিয়ে নালার ভিতর থেকে তাড়িয়ে আনা হয়। বন্দুক-ঘাড়ে নদী নালায় খুঁজতে যাওয়া আত্মহত্যা করার সমান। এই করে কত বিপদ ঘটেছে বলা যায় না। যে জন্তু হয়ত পাথরের পিছনে বা ঝোপে লুকিয়ে আছে সে তোমার গন্ধ পায় ও তোমায় দেখতে পায় এবং তোমার পায়ের শব্দ কোন দিক থেকে এগোচ্ছ বুঝতে পারে। সে যে নিজেই শিকারী তাই সামান্য শব্দেই সে সেই দিকে ফিরে দাঁড়ায়। তুমি দেখবে যদি কুকুরকে মার সে শাস্তি এড়াবার জ্ঞান টেবিল বা চেয়ারের নীচে ঢুকে পড়ে। তুমি যতই আন্তে আন্তে পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে যাও না কেন

দেখবে সে ঠিক তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছে। বাঘ ও চিতার বিষয় এ কথা খাটে তবে ভাল্লুকের অতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নেই ওদের মতো। তাছাড়া বাঘ বা চিতা খুব অল্প আড়ালে বা ছোট পাথরের পিছনেও লুকিয়ে যেতে পারে এটা তাদের বিশেষ সুবিধে। তুমি যতই ক্ষিপ্ৰতায় বন্দুক চালাতে পার না কেন, অনেক সময় হঠাৎ এসে তোমার শিকারে বাধা দিতে পারে। নিজে গাছ বা বড় পাথরের পিছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে, অথ লোককে গাছে চড়িয়ে চারদিকে দেখতে বলা ও ইটপাটকেল ছুঁড়ে সন্ধান করাও বুদ্ধির কাজ। যদি এটা সন্ধ্যার সময় হয় তো সেদিন আর কিছু না করে সকালের জ্ঞাপেক্ষা করা ভালো।

এ কথাও মনে রাখা খুবই দরকার যে উৎসাহের চোটে কোনও মরা বাঘ বা চিতার কাছে যেও না বা ছুঁও না। এইসব বোকামি করে অনেকে বিপদে পড়েছে। বাঘটা মরেছে কিনা তা তার শরীর শক্ত দেখে মনে হলেও মৃত্যুর লক্ষণ বোঝা খুব শক্ত এবং তা সত্ত্বেও আরকটি গুলি চালানোই শ্রেয় বা বল্লমের খোঁচা দিয়ে দেখে নিতে পার। তবু বন্দুক নিয়ে তৈরী থেকে। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন একবার বাঘটা মৃত ভেবে তাকে হাতীর পিঠে তুলে বেঁধে নেওয়া হল। হঠাৎ সে বেঁচে ওঠে আর মাহত তার অঙ্গুলি দিয়ে মারতে তবে মরে। একবার এক কর্ণেল গল্প করেন—এই রকম করেই একটা বাঘ দড়ি ছিঁড়ে ফেলে। হাতী ভয়ে চিংকার করে পালাতে থাকে। বাঘটা একটা মস্ত পাথরের উপর পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ও শেষ পূর্ণন্ত শিকারী ঘাড়ে গুলি করে তাকে ঠাণ্ডা করেন। পরে দেখা গেল প্রথম গুলি তার মাথায় লেগেছিল কিন্তু ভিতরে ঢোকেনি—শুধু একটু ছালের উপর ছিদ্র করে তাতেই ব্যাঘ্রমশায় জ্ঞান হারান।

আমি প্রথম প্রথম চিতা শিকার করেই এ জ্ঞান অর্জন করি। ‘ম’ দাদা বাঘটি মরে গেছে ভেবে টানতে চাইছিলেন কিন্তু আমার সন্দেহ হওয়ায় তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় গুলি মারি। মরা বাঘটি গর্জন করে লাফিয়ে উঠল তবে তখনই ওখানে পড়ে মরে গেল। সৌভাগ্যবশত আমরা কাছেই ছিলাম নইলে এ তর্ক মীমাংসা হবার আগেই আমাদের মৃত্যু হত। আরেকবার এমন অবস্থার পরিণাম শুভ হয়নি, শিকারীরা চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছে—দু-একজন উৎসাহী যুবক বাঘটি টেনে বার করার জ্ঞাপ উৎসুক, লম্বা বর্শা দিয়ে বেতবনের ভিতর বারবার খোঁচাচ্ছে। এ সব আমার মনের মতো হয়নি তাই আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। দেখে মনে হচ্ছিল বাঘটা একেবারে মরে গেছে কিন্তু চক্ষের নিমেষে সে আমাদের আক্রমণ করল যেন তার কিছুই হয়নি। ভাগ্যিস আমি

সামনেই ছিলাম, বন্দুকের নল প্রায় তার মুখের উপর রেখে গুলি ছুঁড়ে মারি। যারা এতক্ষণ লক্ষ্যবাস্তব করছিল তারা পালালো। এদিক ওদিক, দুজন তো গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুঁকে অজ্ঞান হল। আর কেউ বা বেতবনের ভিতর থেকে পালাতে গিয়ে রক্তাভ হল। বেত পাতাবিহীন কিন্তু কাঁটাভরা তাই গায়ে লাগলে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়। সহজে সারে না, মনেও করিয়ে রাখে। যখন জমির দখল নিয়ে ঝগড়া চলে (আইনের অনিশ্চয়তা ও বিচারের দেরীর জন্মই সব দায়ী) তখন দেখা গেছে কেউ কেউ বাঁশের লাঠিতে কাঁটাবেত বেঁধে লড়াইয়ে উপস্থিত, বড় বড় বাবড়া-চুলধারী লাটিয়ালরাও এ অস্ত্রের সামনে যেতে চায় না।

অনেকেই এক গুলিতে বাঘ, চিতা, ভাল্লুক বা বাইসান মেরেছেন বলে গৌরব বোধ করেন। আমার তাঁদের অহঙ্কারের কথা শুনতেই ভালো লাগে কিন্তু নিজের কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলে এ গৌরবের কথা মনেও আনি না—তখন এক গুলির চেয়ে দু' গুলি মারাই শ্রেয় মনে করি। তোমাদের এরকম 'এক গুলিতেই মেরেছি' গর্ব করে বলতে পারার উপদেশ আমি দেব না। যখন আমি খুব কাঁচা শিকারী, একবার একটা চিতাবাঘ মেরে সেটা তোলার জন্য লোক ডেকে ফিরে এসে দেখি মাটির উপর রক্তের দাগ জমে আছে, চিতা কোথায় অন্তর্ধান হয়েছে। সব বন জঙ্গল পিটিয়ে, সম্ভব অসম্ভব জায়গা খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। মনে রেখো কাতুজ ব্যবহারের কার্পণ্য করো না—যত তাড়াতাড়ি পার একেবারে মেরে ফেলো, তাহলে আহত জন্তু অনুসরণ করার কথাই উঠবে না, তোমারও আপসোস হবে না। আহত জন্তু যে সব সময় বিপজ্জনক হয় তা নয় তবে যাদের নখ দাঁত ও শিং আছে তাদের বিশ্বাস না করাই ভালো—আর যতটা দূরে রাখা দরকার সেই নিয়ম মানলেই যথেষ্ট।

২৪শে নভেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ

চিঠি লেখা বন্ধ ছিল ক'দিন। আমি অক্টোবর মাসে শিকারে গিয়েছিলাম ও বেশ কিছু শিকার লাভ হয়েছিল—কিন্তু কলকাতা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যে জরের বিষ শরীরে প্রবেশ করেছিল সেটা চেপে ধরল। বাইসান বা গৌর মারতে গেলে জ্বর হবেই তবে শিকার পেয়ে জ্বর হলেও মনে দুঃখ থাকে না। আশ্চর্য যে জঙ্গলে

থাকতে জর দেখা দেয় না—বাড়ি ফিরে আরাম ও শান্তিতে বিশ্রাম করতেই জর ছাড়তে চায় না। প্রচুর কুইনিन খেয়ে বিশ্রাম করতে পারলেই ব্যাধি দূর হয়।

এখন আরও বাঘের কথা বলে তারপর অন্য গল্প শুরু করব। আগে এ বিষয় মনোমুগ্ধকারী কিছু গল্প বলি। বাঘ যখন কোনও প্রাণী হত্যা করেছে সেখানেই তার প্রতীক্ষায় বসে থাকা শিকারীর খুব প্রিয় না হলেও কোনও কোনও জায়গায় এ উপায় ছাড়া গতি নেই। তবে তাতে নিরাশ হবার কারণও থাকে। দু-চারটে উপদেশও শুনে রাখা ভালো।

বাঘকে জীবহত্যার লোভ দেখিয়ে আনা খুব শক্ত নয়। স্থানীয় লোকজন শিকারী না হলেও ঠিক কোথায় জন্তু বাঁধলে বাঘ আসবে এ তারা ঠিক জানে। বলদ বা মোষ যেটাই ইচ্ছে বাঁধা যায়—ছোট হলেই ভালো। বাঁধন দড়ি গলায় ও পায়ে বাঁধতে হয়। তবে এত শক্ত করে বাঁধা নয় যে বাঘেও ছিঁড়তে পারে না—তাতে আমার মত নেই। বাঘ জন্তুটা মেরে টেনে নিয়ে যায় আর দড়ি ছিঁড়তে না পারলে হয়ত এক গ্রাসও না খেয়ে চলে যায়। একবার এই রকম দড়ি ছিঁড়তে না পেরে বাঘটি বলদের মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে ধড়টা টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাঘের মতো সন্দেহ করা স্বভাব অন্য জানোয়ারের নেই। সব জিনিসেই তার সন্দেহ, জীবিত বা মৃত কিছু যায় আসে না, এতেই তার বিচার-শক্তির পরিচয়। আমি তোমায় আইন-ব্যবসায়ী হতে বলি না—বিশেষত জজ হবার কারণ তাঁদের দোষের মধ্যে বিচারশক্তির অভাব, ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা উচিত তাঁদের নির্বিচার গুণ সব চেয়ে প্রবল। লর্ড ম্যাকনটন কি বলেন শোন—“রাজ-বিচারকগণ কলিকাতার উচ্চ আদালতের রায় গ্রাহ্য করতে অসমর্থ। বিদ্বান পণ্ডিত বিচারপতিগণ জীবিত কি মৃত সকলের সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন, প্রত্যেককেই নির্বিচারে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন।” I R L (Page 684-693)

এ বাক্যের অর্থের দরকার নেই।

ব্যাঘ্রমশায়ের বিচারশক্তির বিষয় এ কথা বলা চলে। যে জীবটি তার জন্য বাঁধা হয়—তা বাঁধার নিয়মকানুন দেখেই সন্দেহ করে যদি কিছুমাত্র অন্যথা হয়। মৃত জন্তু যদি অল্পও সরাও তাহলে সে চম্পট দেয়। তুমি যতই কষ্ট করে গাছের ডালে বসে প্রতীক্ষা কর তার দেখা পাবে না। দিনহুপুরে কখনও কখনও সে মৃত জন্তুটি দেখতে ও শেয়াল বা শকুন তাড়াতে আসে। আর যদি সেখানে কোনও রকম ব্যতিক্রম দেখে তাহলে চলে যায়, আর ফেরে না।

শেয়াল শকুনের হাত থেকে রক্ষা করতে সাধারণত জন্তুটি টেনে

বেশ দূরে নিয়ে যায়। যদি কখনও মাচায় ওঠার সময় দেখে যে চাঁদনী রাত সবে ও রাতের ছায়ায় মরা জন্তুটি দেখা যাচ্ছে না তখন সেটা দু-এক গজ দূরে সুবিধে মতো সরিয়ে রাখলে ক্ষতি নেই কিন্তু সাবধান ঠিক যেরকম ছিল সেই রকম রেখো। যদি নিঃশব্দে করতে পার তো ঐ জন্তুর উপর দু-একটা ডালপালা ভেঙে আড়াল করে দিতে পার। যে সব লোক তোমার সঙ্গে এসেছিল ফিরে যাবার সময় অন্তত একশো গজ অবধি যেন একেবারে কথা না বলে চলে যায়। চাঁদনী রাতে জঙ্গলের আলোছায়া এমন সরতে থাকে যে ঐ মরা জানোয়ার একমুহূর্ত আগে যা দেখা যচ্ছিল পরমুহূর্তে নিবিড় আঁধারে সেটা অদৃশ্য হয়—বনের সবই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে।

সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় ‘গারা’ বাঁধা হয় ও একটার বেশী মারা পড়ে। যদি তোমার সঙ্গী দ্বিতীয় বন্দুক না থাকে—তাহলে ঐ মরা জন্তুটি সরিয়ে অরেকটি জীবিত বেঁধে অল্পগুলিও সরিয়ে নিও। এটি মারা নিশ্চয় পড়বে ও তাতে পরের দিন শিকারের সুবিধে হবে। অল্পদিন আগেই সামান্য ভুলের জন্তু একটি প্রকাণ্ড বাঘ মারার সুযোগ হারাই। আমাদের শিবিরের অল্পদূরে একটা বাঘ ভোরেই একটি জন্তু মারে। আমি পায়ে হেঁটে খোঁজ করার কথায় সকলেরই আপত্তি হল। তাই সকাল সাতটার সময় হাতীতে চড়ে আমি ও অরেকজন বন্ধু ঐ বাঘটির খোঁজে যাই। আমাদের এ ঘোরাঘুরিতে শব্দ কিছু তো হয়েই থাকবে—বিশেষত পাহাড়ে জঙ্গলে এ খুবই সম্ভব এবং তাই শুনে বাঘটি পালাল। সেখানে সে যে খাওয়া শেষ করেছে ও তাড়াতাড়ি চম্পট দিয়েছে সেটা তার বড় বড় পায়ের খাবার চিহ্ন দেখে বোঝা গেল। নিরাশ হয়ে ফিরলাম। তাই নটায় মাচা বাঁধতে যাবার সময় বন্দুকটি হাতে নিইনি। জঙ্গলে যেতে এরকম নিবুদ্ধিতার কাজ আর কখনও করিনি। সঙ্গের লোকজন একটু দূরে রেখে আমি এগিয়ে যাই, খুব সতর্ক হইনি তবে এইটুকু সাবধান হয়েছিলাম—বাঘের আসার বিপরীত পথে যাই। ঐ মরা জন্তুটির গজ ত্রিশ দূরে পৌঁছেছি খুব সাবধানে গাছের পাশ দিয়ে, পাথরের আড়ালে ও বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে। হঠাৎ কিছু নড়ল মনে হল ও তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে দেখি প্রকাণ্ড রাক্ষুসে বাঘ দাঁড়িয়ে। সবমাত্র মরা জন্তুটার কাছ থেকে সরে এসেছে। হুজনে মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত মাত্র, দশ গজ দূরে ব্যাঘ্ররাজ অতঃপর ধীরে ধীরে পাহাড়ে চলে গেল। বন্দুক হাতে থাকলে এ লক্ষ্য অব্যর্থ হত। সব রকম সতর্কতা ও সাবধানতায় মাচা বাঁধা হল। অতি ধীরে ও নিঃশব্দে কিন্তু রাত ন’টা অবধি আমরা প্রতীক্ষা করে বসেছিলাম। বাঘ তখনও এল না,

সারা রাতেও দেখা দিল না।

পরদিন দু মাইল দূরে একটা মোষের বাচ্চা মারার খবরে আমরা সেখানে একটা বুড়ো মোষ বাঁধলাম। মনে ছিল আগের রাত্রে সে যায়নি ও ঐ ছোট বাচ্চা খেয়ে তার ঐ বিরাট শরীরের ক্ষুধা মিটবে না। এ বুড়ো মোষটা সে মারল কিন্তু এমন শক্ত গিট বেঁধেছিল যে বাঘেও নড়াতে পারল না। শুনলাম ছোট মোষটার মাথা ও কটা হাড় নাকি আছে। এটা অল্প মোষটির দশ গজ দূরে ছিল। মাচা যেখানে বাঁধা হয় সেখান থেকে বুড়ো মোষটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাঘ এ পথে এলে আর তাকে পালাতে হত না। ভুলের অধ্যায় তখনও শেষ হয়নি—প্রথম মারা জন্তুটা কতটা খেয়ে শেষ করেছে সেটা লোকের কথায় বিশ্বাস না করে আমার স্বচক্ষে দেখা উচিত ছিল। এই হল দ্বিতীয় বারের ভুল। আগে জানলে ওটার পাশে মাচা বাঁধতাম যেখান থেকে দুটোই দেখা যেত। বাঘও একটার সন্ধানে অল্পটার দিকে আসত। সন্ধ্যা সাতটার একটু আগে আমার মাচার দু'দিকে দুটি বনমোরগ ডাকতে শুরু করল। ভাবলাম মাচা বাঁধার শব্দ বাঘের কানে গিয়ে থাকলেও এ পাখীর গানে তার সন্দেহ দূর হবে। কিছুক্ষণ পর নিশাচর পাখী ডেকে উঠল সকলকে সাবধান করে দিতে—তারপরই ব্যাঘ্রবীরের ধীর সাবধানী ও ভারী পায়ের শব্দ ও গলার ঘড়ং আওয়াজ কানে এল। আরও কাছে এগিয়ে আসার পর হাড়ের খড়মড় আওয়াজ এল ও পরেই কচমচ শব্দে বুঝলাম মোষের অস্থির গুলটপালট করে যা কিছু মাংস অবশিষ্ট ছিল তার সদ-ব্যবহার করেছে। একটু থামার পর মনে হল সে বেশ সুস্বাদু ও রসালো মাংস খাচ্ছে। হাতের ঘড়িটায় দেখলাম এক ঘণ্টা এই আহার চলেছিল। আমার মাচা থেকে অনেক চেষ্টা করে চোখ ঘুরিয়েও ঐ ডোরাকাটা জীবটি দেখতে পেলাম না। এই এক ঘণ্টা পর ভোজন শেষ করে ব্যাঘ্ররাজ যাত্রা করলেন—ভাবলাম হয়ত জল খেতে গেছেন আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না, অল্প মোষটি ছুঁলেনও না।

মাচা বাঁধার নিয়ম মাটি থেকে পনের ফুট উপরে—কেউ নিজের রুচি অনুসারে আরও উচুতে বাঁধেন আর এও দেখি কেউ কেউ ভাবেন পদমর্দাদা অনুসারে আরও উচুতে বাঁধা উচিত। আমি বেশ নীচুতে মাচা বাঁধার পক্ষপাতী—ধর এই বারো ফুট। তাছাড়া তার সামনে ডালপালা দিয়ে অন্ধকার করে রাখা ভালো লাগে না। সামান্য দূর থেকেও সেটা চাষার ক্ষেত পাহারা দেবার মাচার মতো দেখায়। মাচার সামনে দু-একটি ছোট ডাল টেনে যথেষ্ট আড়াল করা যায়।

নিজ্ঞে একেবারে নিঃশব্দে ও নিশ্চলভাবে যদি বসে থাকতে পার তা হলে সে নিচে বসে বা মাচায় বসে শিকার কর না কেন ? কোনো জানোয়ার তোমায় দেখতে পাবে না। এই ক’দিন হল আমার এক বন্ধু গুলি চালিয়ে উৎসাহের চোটে মাচায় নড়ে উঠতেই ভাল্লুক টের পেয়ে ছু পায়ে দাঁড়িয়ে, চিৎকার করে এসে তাঁর জুতোয় থাবা মারে। তিনি তাঁর ‘Paradox’ বন্দুকের নল একেবারে প্রায় তার গায়ের উপর রেখে চালিয়ে তার ভবলীলা সাদ্ধ করেন। যদি নদীর কাছে মাচা বাঁধা হয় তো নিশ্চয় জেনো বাঘ গোধূলির সময় নয় রাত আটটা অবধি নিশ্চয় আসবে—এর চেয়ে বেশী রাত অবধি অপেক্ষা করায় কোনও লাভ হয় না।

আজকাল বন্দুকের ‘সাইটে (Sight) রেডিয়াম’ ব্যবহার হচ্ছে। এটা অত্যন্ত রকম উজ্জ্বল আলো ও নানারকম আলো যা ব্যবহার হয় তার চেয়ে ভালো। যার যা ইচ্ছে তাই করুক কিন্তু তুমি ‘রেডিয়ামে’ই সন্তুষ্ট থেকে। বন্দুকে এটা অতি কম দামেই লাগানো যায়। আর যদি আগে থেকেই লাগানো থাকে ভালোই নইলে বন্দুক ফরমাস দেবার সময় যারা বন্দুক তৈরী করে তারাই খুব নিখুঁতভাবে লাগিয়ে পাঠাবে।

এ চিঠি শেষ করার আগে আরও বলি, অনেক সময় বাঘ রাতের পর রাত বাঁধা জন্তর দিকে কোনও রকম দৃষ্টিপাত না করে পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই রকম করে দু রাত সে জন্তর পাশ দিয়ে জল খেতে গেছে কিন্তু তাকে স্পর্শও করেনি, তার প্রকাণ্ড থাবার দাগ দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তৃতীয় রাত্রে সে যখন যাচ্ছে তখন শিকারী বলদের অস্থিরতা দেখে বুঝলেন ও দেখলেন বাঘটি ভ্রক্ষেপ না করে চলেছে—তখন তাঁর গুলিতে সে মারা পড়ে।

১লা ডিসেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

দেশের বাড়ি থেকে তোমরা অনেকবার চিতাবাঘের ও করাতে কাটার মতো গর্জন শুনেছ রাত্রে সে যখন ঘুরে বেড়ায় নিজের শিকারের খোজে। যতদিন আমার গুলিতে মারা পড়েনি ততদিন এ শব্দের বিরাম হয়নি। যখনই শিকার সফল হয়েছে ও মরা বাঘ উঠোনে এনে নামানো হয়েছে, দেখেছ ও সে কাহিনী

শুনেছ এবং অল্প দিনের শিকারের গল্পও তোমাদের বহুবার বলায়ও আরও শুনেছে চেষ্টা কর।

চিঁতা বাঘ বড় হিংস্র ও বদমেজাজী জন্তু। অল্প জন্তুর চেয়ে একে মারতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে কারণ এরা খুব চতুর ও বিপজ্জনক। গ্রামের চারদিকে ঘোরে ও নজর রাখে এবং হঠাৎ তোমার পোষা কুকুরটার লোভে এসে উপস্থিত হয়। ভেড়া, ছাগল, বাছুর ও গ্রামের কুকুর খেয়ে সাবাড় করে, গরু বলদও পার পায় না। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে প্রতি রাত্রে অল্প অল্প চিঁতা এসে বড় বাঘের জন্তু বাঁধা মোষ, বলদ যেরে খেয়ে আরামে গুহায় লুকোত। সমতল জায়গায় ও গ্রামে তাদের শিকার করা খুব মুশকিল, এরা খুব পালিয়ে বেড়ায় সর্বত্র ও বেত বনে লুকিয়ে পড়ে। বড় লম্বা ঘাস বনে হাতীতে চড়ে বড় বাঘ মারার মতো চিঁতাও শিকার করা হয়। অনেক শিকারী রাইফেলের গুলির চেয়ে S.S.G. দিয়ে মারার পক্ষপাতী। হাওদায় নিরাপদে বসে যদি এ রকম মারা যায়, তাও এ পরামর্শ আমি দিই না। এরা খুব বড় হলে আট ফুট লম্বা হয়। যারা এদের বেশী দেখেননি তাঁরা এদের তুচ্ছতাচ্ছল্য করেন কিন্তু তুচ্ছতাচ্ছল্য করার মতো জন্তু এরা নয়। এরা মানুষের কাছাকাছি থাকে তাই মানুষকে তেমন ভয় করে না। বড় বাঘের চলাফেরা ধরনধারণ যদি শিকারীর জেনে রাখা দরকার মনে কর তাহলে এই জানোয়ার যে এমনই আক্রমণ করে তাই এর নির্ভীকতা ও দুষ্টি বুদ্ধির জন্তু সাবধান হওয়া দরকার। বিনা কারণেই এরা আক্রমণ করে। বাঘ যে জায়গায় তোমায় প্রথম গুলি মারার সুযোগ দেয় এরা তা দেয় না। যদিও কখনো কখনো দেখা যায় বড় বাঘ বা চিঁতা ভীকুর মতো ব্যবহার করেছে। এরা খুব চটপটে ও ক্ষিপ্ত, সাপের মতো এঁকেবঁকে অতি অল্প জায়গায় ঘুরতে পারে। যেখানে প্রায় অড়াল নেই বললে চলে সেখানেও দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে পড়ে। চিঁতা বাঘিনী বাঘের চেয়ে ছোট হয় কিন্তু সে চালাক বেশী, শিকারেও বেশী দক্ষ। সম্ভান-সম্ভাবনার আগেই সে স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকে ও বাচ্চাদের তার কবল থেকে নিরাপদে রাখার জন্তু নানা উপায় বার করে। খুব সাহসেই আক্রমণ করে। নিজের নিরাপদ স্থান থেকে সহজে বেরোয় না। চলাফেরায় খুব সচেতন ও সব রকম আড়ালের সুযোগ নিয়ে চম্পট দিতে ওস্তাদ। হাঁকা হলে দৌড়ে সে বাঘের আগেই আসে যদি একসঙ্গে থাকে, দেখা গেছে চিঁতা বাঘ বাঘিনীকে অনুসরণ করে ধীরেস্থলে আসছে।

পূর্ণবয়স্ক বা খুব বড় না হলে আমি বাঘিনী মারি না। চিতার বাচ্চাদের

বিষয়ও এই নিয়মে চলি। তবে ভুলও হয় কারণ খুব ঘন জঙ্গলে যখন চলে চামড়ার গুল দেখে বাঘ বা বাঘিনী বোঝা শক্ত। এদের খাবার ছাপ দেখে তফাত বোঝা যায় ও তাই দেখে আমি অনেক সময় শিকার বন্ধ করেছি। চিতাবাঘিনীর গলা বেশী লম্বা হয়। চোখ কান খুলে রাখলে ও ভয় না পেলে এর প্রভেদ দেখতে পাবে। এরা অনেক বিষয় এত অল্প রকম যে তা সহজে বর্ণনা করা যায় না। বুনো শুয়োরের মধ্যে এ প্রভেদ অভিজ্ঞ শিকারী ভিন্ন আর কারুর চোখে পড়ে না। অনেকে তাই ঘোড়ায় চড়ে বরাহ মারার জন্য অনুসরণ করে, শূকরী দেখে নিরাশ হয়ে ফিরেছেন। চিতা শিকার করাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। কিশোর বয়সেই আমি রাইফেল ব্যবহার করতে শিখি এবং সেই সময়েই প্রথম দু-চারটে চিতাবাঘ মারি। আমার শিকারের জ্ঞান ক্রমশ বেড়েছে। তিন বছর ইংলণ্ডে ছিলাম। ঐ সময়টুকু ছাড়া এবং বাঘিনী ও চিতাশিশু মারায় সংযম করার ফলে তা সত্ত্বেও প্রতি বছর একইভাবে যতগুলি মেরেছি ততই বেড়েছে। নিজের জমিদারীতে ষাড়া সর্বসর্বা তাঁরা যখন-তখন বাছবিচার না করে চিতা, বাঘ, মোষ ও গভার শিকার করেছেন। তাই হয়ত এ সব জন্তুজানোয়ার অল্পত্র চলে গেছে বা শিকার করে নিমূল করা হয়েছে। আমাদের সাত ভাইদের মধ্যে যে অল্প জমিটুকু আছে সেখানে জঙ্গল খাল বিল অনেক। সেখানে চিতাবাঘ ও বরাহ প্রচুর, আর বুনোহাঁস ও স্নাইপের অভাব নেই। যখন তোমার শিকার শুরু হবে, আমার সারা হবে—তখনও দেখবে আমাদের দেশে, উত্তরাধিকার হিসাবে যা থাকবে তাও অনেক দিন শিকার করতে পারবে।

সব সময় সব কথায় গম্ভীর হয়ে থাকা আমার ভালো লাগে না। কবির শাস্ত্রীর গুরুগম্ভীর বেড়ালের গাম্ভীৰ্য আমার পছন্দ নয়। একবার শিকারে দলবলে বনে আগুন পোয়াচ্ছিলাম তখন একজন এ গল্পটি বলেন। একবার একটি হলো। বেড়াল চিতাবাঘিনীকে বিয়ে করে—বংশগৌরবে তার চেয়ে উঁচু ঘর হলেও বাঘিনীর মত ছিল না। তবু এ সম্ভব হল কি করে? যিনি গল্প বললেন তাঁর কথায় বলি যে ‘জীজাতী সহজে বশীভূত হয় না।’ এ কথায় তিনি সচরাচর পুরুষের অভিমত জানালেন এবং জীজাতির নিন্দা করলেন। তবুও এ অঘটন এই বেড়াল ঘটালো কি করে? সে গৃহস্থের বাড়িতেই থাকত, দুধের প্রতি লোভে রোজই সে সকলের জন্য রাখা দুধ চেটেপুটে শেষ করত। বেড়ালের প্রতি তাদের বিশেষ ভালোবাসা ছিল না তাই বাড়ির গিন্নীকে হুকুম হল দুধ ঢাকা দিয়ে রাখার। গিন্নী ভালো টুকরি বা চান্দারি ছিল না দেখে একটা মস্ত ভাঙা ও হেঁদাওয়ালো ধামা

দিয়ে ছুপ ঢাকলেন। যেটা একটু আধটু দেখা যায় সেটাই বেশী লোভ দেখায়
 শুনেছি—অন্যত এ বেড়ালের তাই হল। আর কোনও কথা নেই। কী পরিণাম
 হবে না ভেবে, ভাঙা ধামার ভিতর মাথা গলিয়ে দুধটুকু চেটেপুটে শেষ করল।
 কিন্তু ধামাটি গলায় আটকে রইল। বহু চেষ্টা করেও সেটা ছাড়াতে পারল না—
 তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। সকলে তাকে দেখে ও হাসে, মাছুষ ও বেড়াল
 কেউই রেহাই দেয় না। সকলের কাছে শুধু যে অগ্রিয় হয়ে উঠল তাই না—তার
 জীবনধারণ করা মুশকিল হয়ে উঠল। না খেতে পেয়ে দুর্বল শীর্ণ হয়ে মনের দুঃখে
 বনে গেল। খুশী হয়ে বেড়াল যেমন ‘গুরগুর’ আওয়াজ করে তাই শুনে গাছের
 উপর থেকে উঁকি মেরে দেখে, তিনটি বাঘের ছানা মা-বাপের শিকার করা মাংস
 মনের স্থখে বসে বসে খাচ্ছে। বাপ মা আরও শিকার করে আনতে চলে গেছে।
 এই স্থবিধে বুঝে বেড়াল এসে তাদের ভাগের সব মাংস খেয়ে সাবাড় করল। বাচ্চা-
 গুলো ঐ অন্তত ধামাগলায় জন্তুটা দেখে ভয়েই অস্থির। প্রতি রাত্রেই বেড়ালের
 এরকম ভূরিভোজন চলল। অবশেষে বাঘিনী বাঘকে বলল বাচ্চাগুলো দিন দিন
 এরকম শুকিয়ে রোগী হয়ে যাচ্ছে কেন? তারা খবরদারী করতে বসে রইল।
 বেড়াল আবার এল, আর যেই খেতে যাবে সে মুহূর্তে বাঘ রাগে অন্ধ হয়ে আক্রমণ
 করল। বেড়াল পালাল—বাঘও পিছনে ছুটল। বেড়াল একটা গাছের ফোকরের
 ভিতর ঢুকে গাছে চড়ে গেল। বোকা বাঘ না ভেবেচিন্তে ঢুকতে গিয়ে দম আটকে
 মরে গেল। বেড়াল নেড়েচেড়ে দেখে নিল বাঘ মরেছে কিনা এবং নিঃসন্দেহ হয়ে
 বাঘিনীকে গিয়ে বলল, ‘দেখ, বাঘটা তো মেরেছি এখন তোর ও বাচ্চাদের ঐ
 হৃদ্পা হবে যদি তুই না আমায় নিকে করিস।’ বাঘ ফিরছে না দেখে ভাবনায়
 পড়ল ও বেড়ালের কথা সত্যি কিনা জানতে গিয়ে দেখল বাঘটা গাছের ফোকরে
 মরে পড়ে আছে। দায় পড়ে বাঘিনী নিকা করল ও কিছুদিন সকলে স্থখে
 কাটালো। দিন কাটে মাস কাটে, বেড়াল নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বাচ্চাগুলো বড়
 হচ্ছে, গায়ের জোরও বাড়ছে, তাদের সংবাপের সঙ্গে খেলা প্রায় মৃত্যুতুলা হল তার
 পক্ষে। তাদের আদরে সে মরেই যাচ্ছিল প্রায়। তখন ঘোর বর্ষা—শিকার
 মেলা ভার, বাঘিনীকে বোঝাল যে নদীর ওপারে প্রচুর শিকার পাবে। বাঘিনী
 সহজেই রাজী হল। নদীর ধারে আসতেই বেড়াল বলল, তোমরা এগোও, আমি
 ছোট জীব আগে যাই কি করে। মাকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখে বাচ্চারাও অল্পসরণ
 করল ও বর্ষার খর-স্রোতে শেষে ডুবে মরল। বেড়াল মনের আনন্দে তীরে দাঁড়িয়ে
 দুর্ঘটনা দেখল। তারপর তার পুরানো গ্রামেই ফিরে গেল। বাঘের তাড়ায়

পালাবার সময় ধামাটিও তার গলা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই স্থখেই দিন কাটল। এ গল্পের শেষে নৈতিক উপদেশ দিতে পারি না কারণ আমি শিকারী, এ কাজ আমার নয়।

৮ই ডিসেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

বয়েস বাড়ার সঙ্গে ছেলোমাহুদী ছাড়তে হয়—বুড়ো না হলেও আমার বয়েস হয়েছে। আমি সর্বদা জুতো জামা, শীলের গালা বা রাজারাজড়ার গল্প করতে পারি না। তাই আমার প্রিয় বিষয়বস্তুতে ফিরে যাওয়াই ভালো। এবার এ চিঠিতে দুটি বিশেষ ঘটনার বিষয় বলব। জানই তো যে বরাহ বাঘকেও ভয় পায় না। অথচ কোনো জন্তুকে এরকম নির্ভয়ে প্রাণ দিতে দেখা যায় না। বাঘ বা চিতা গুলি খেয়ে মরে না গেলে বা অজ্ঞান না হলে গর্জন করবেই আর ভাল্লুক আহত হলে কাতরে কাতরে মড়াকানা কাঁদে কিন্তু বরাহ গুলি লাগুক বা বল্লমের ফলা শরীরে বিধুক জ্বাফপও করে না। বিশাল বরাহ, চিতা ও বাঘ কখনও এক জঙ্গলে থাকে না। যদি বা না জেনে থাকে তো জঙ্গলের আলাদা আলাদা জায়গায় আস্তানা গাড়ে। একটি চিতাবাঘ যে কি সাহসে শুয়োরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলো জানি না। এক সকালে শিকারীরা ও আমি চিতা ও বরাহের দ্বন্দ্বের বিষয় শুনলাম ও সে জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম এর নিভুল চিহ্ন রয়েছে। এক চাষা ক্ষেত পাহারা দিতে স্বচক্ষে এ দ্বন্দ্ব দেখে ও বলে প্রায় আধঘণ্টা এ লড়াই চলে। সে জায়গাটি শুয়োরের খুরের গর্ত ও রক্তে লাল হয়ে আছে। যেখানে জমিতে বাঘের আঁচড় পড়েছে সেটা একটু বেশী রক্তে ভেজা। তাদের আস্তানা খুঁজতে কিছু সময় লাগল। বাঘটা বেশীদূর যেতে পারেনি। তার চলাফেরা দেখে মনে হল, বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে। হৈ-হল্লা করে তাকে আগেই জঙ্গলের বাইরে আনা হল। দেখলাম ভীতু কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে আছে, তাকে গুলি করে মারলাম। পরে দেখলাম বাঘের বুকের ছালচামড়া ছিঁড়ে গেছে, বেশ অনেকটা মাংসও ক্ষতচিহ্ন। সে লম্বায় সাত ফুট ও বেশ মজবুত জানোয়ার। শুয়োরের পিঠে আঁচড়ের দাগ ও মাথায় গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। মাটিতে মাথা ঘষে সে ক্ষতগুলি কাদায় ভরে নিয়েছিল, তাছাড়া এ লড়াই তাকে বিশেষ কাবু করেছে বলে মনে হল না। সে এত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বেরিয়ে এল যে

ভাবলাম হয়ত গুলি ফসকাল। লড়াইয়ে জেতার গৌরব তারই, তবে বাঘের ছাল আমারই ভাগো লাভ হল।

চরের জমিতে ঘাস ও শরবন খুব উঁচু, দেখে মনে হয় বাঘ থাকার উপযুক্ত জায়গা। শুনলাম এখানে একজোড়া বাঘ এসে আস্তানা নিয়েছে। আমি ও ‘R’ দু’দিন ধরে এখানে উঁচুনীচু জায়গা সব খুঁজেছি। শিবিরে ফেরার পথে একটা মরা গরুর উপর হোঁচট খেলাম, এটা চিতা বাঘের মারা। সবদিকে সম্ভব স্থান হাঁকা করান হল—বুথাই। ‘R’ বললেন, মরা গরু যেখানে সেখানেই বসা যাক। চাঁদনী রাত, চাঁদটি বেশ বড় তবে তার উজ্জ্বলতা যতই থাকুক চিতাটি ছায়ায় ছায়ায় বেড়ায়। তার খাওয়ার কচমচ শব্দ পেলেও তাকে দেখতে পেলাম না। আমরা সন্ধ্যোগের জন্ত অপেক্ষা করে রইলাম। হঠাৎ পিছন থেকে একটা গুয়ের ঘোঁতঘোঁত করতে করতে এসে কোনও দিকে ভ্রক্ষেপ না করে সোজা চিতাটিকে আক্রমণ করল। চিতাটি লেজ গুটিয়ে পালাল। শিকারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু তাহলেও এ একেবারে নতুন। ‘R’ ও আমি দুজনেই আশ্চর্য হয়েছিলাম। গুয়েরটি মরা জন্তুর ভিতর মুখ ঢুকিয়ে বেশ খেতে আরম্ভ করল, বেশ অনেকক্ষণ তার আহার চলেছিল। চিতাটি আবার এসে তার খাবারের দিকে গিয়ে আহার শুরু করল—গুয়েরের মুখের গ্রাস শেষ হতেই তাকে তেড়ে গেল, সেও চম্পট দিল। একবার নয় তিন চারবার এরকম হল। বুথা বসে শ্রান্ত লাগছিল, প্রচণ্ড শীতও ছিল। আমরা ঠিক করলাম যেদিকে চিতাটি আছে সেদিকে গুলি চালাতে। জানোয়ার দেখা না গেলে শুধু শব্দ শুনে গুলি চালানো ঠিক মনে হয় না, তবে উপায় ছিল না। তাছাড়া হাতী এগিয়ে আনার জন্ত সঙ্কত করে বন্দুকের অওয়াজ করতেই হত, তাই মরা গরুটার দিকে গুলি চালানো লাভাস্ত হল। ‘R’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার লাগল নাকি?’ আমি বললাম, ‘না, কিন্তু কেন?’ তিনি তখন বললেন তাঁর বন্দুকের নল ফেটে গেছে। দেখি বন্দুকের ডান নলটি ফেটে যেন একটা কিস্তুতকিমাকার পাখীর মতো হাঁ করে রয়েছে। ‘R’ ভাবলেন দোষ বন্দুকের কিন্তু আমার মনে হল বাজে দোকানে কেনা খারাপ কাতুঁজ এর জন্ত দায়ী। তবে দোষ যারই হোক, যে দোকানে কেনা তারা বন্দুকটির নল বদলে সব ঠিক করে দিল।

পরদিন দেখা গেল আমাদের গুলি অনেক দূরে লেগেছে। গুয়েরটাও মাংস ও গরুর পেটে যত ঘাস ছিল সব ভুরিভোজন করেছে। বুনোগুয়ের মাংসভোজী শুনেছিলাম কিন্তু তার এই অভিনব আচরণ আশ্চর্যকর। গুয়েরটা বেশ বিরাট

—সে আগে থেকেই হয়ত চিতাটাকে জানত—তা নয়তো বিনা আড়ম্বরে তার মুখের গ্রাস এরকম করে কেড়ে নেওয়া কখনও দেখিনি, শুনিওনি।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

খুবই সাবধান হওয়া দরকার পায়ে হেঁটে বাঘ ভাল্লুক শিকারে। চিতা শিকারে সেটা আরো বেশী প্রয়োজন। চিতা চতুর, ক্ষিপ্র ও সতর্ক। রাত্রে গ্রামের আশেপাশে ছাগল বা কুকুর ধরার চেষ্টায় থাকে তাই মানুষকে বেশী ভয় পায় না। তোমার তাঁবুতে যদি কুকুর থাকে তাহলে চিতা নিশ্চয় আসবে ও তোমার প্রিয় টেরিয়ার কুকুর নিয়ে পালাবে। এ বিষয়ে ভারি চমৎকার আচমকা হামলা দেখেছিলাম। গোধুলির সময় 'মো' দাদা ও আমি বনের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি হঠাৎ একটি সুন্দর সুঠাম চিতা বনের ভিতর থেকে লাফিয়ে এসে তাঁর টেরিয়ারটি মুখে নিয়ে অদৃশ্য হল। কুকুরটি আমাদের আগে আগে টুকটুক করে চলছিল। গজ পনের এগিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল, বেচারীর ঐটুকতেই জীবনলীলা শেষ হয়ে গেল। আরেকবার এই রকম হয়েছিল, এবার দাদার একটি রামপুর হাউও আমাদের আগে আগে চলছিল। আমরা ঝিল থেকে ফিরছিলাম, বিপদের কোনো পূর্বাভাসও ছিল না। এক মহূর্তের জ্ঞান কালো ছায়া পড়ে জঙ্গলের ধারে—চিতাটি গুড়ি মেরে এসে কুকুরটি মুখে নিয়ে পালালো। সবই এত তাড়াতাড়ি হল যে গুলি করার সময় হল না। শপথ করলাম এর প্রতিশোধ তুলতেই হবে। শপথ করা সহজ, কাজে করা আরেক কথা। তারপর ওখানেই আমরা অনেকগুলো বড় বড় চিতা মারি। মনে এই ভেবে সাহস পাই যে তার মধ্যে ঐ হৃস্ক্যার চিতা দুটি নিশ্চয় মারা পড়েছে। প্রতিশোধের তীব্রতা—দেবী হলে কমে আসে।

কুকুর চিতার প্রিয় খাদ্য, গ্রামের দেশী কুকুর এ কথা ভালো করেই জানে। কত সন্ধ্যায় দেশের বাড়ির উঠানে প্রাণপন চেষ্টা করেছে ঢোকার জ্ঞান, নিরাপদ আশ্রয় পাবে জেনে। একবার একটি কুকুরকে বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে পরে আপসোস হল জেনে যে রাত্রেই চিতা তাকে নিয়ে গেছে। কোনও কোনও পাহাড়ে জঙ্গলে চিতার উপদ্রব বেশী। দিনে তারা গুহায় লুকিয়ে থাকে, বনপিটে হাকাতোও বেরোয়

না। মরা জানোয়ার বা জ্যান্ত ছাগল বেঁধে দিলে সে ম্যা ম্যা করে, সেই জায়গায় বসে অপেক্ষা করে মারা একমাত্র উপায়। একবার আমরা বড় বাঘের জন্তু নানা জায়গায় অনেকগুলি মোষ বেঁধেছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় রাতের পর রাত চিতা এসে তাদের মেরে খাচ্ছিল, আরো বিরক্তিকর মনে হয়েছিল কারণ ঐ মরা জন্তুর পাহারায় অতি সাবধানে বসেও তাদের দেখা পাইনি। পরদিন শিকারীরা এসে খবর দিল যে ওগুলি সকালের আগেই খেয়ে সাবাড় করেছে। তখন মনে হল যেন কাটা ঘায়ে হুনের ছিটে। শুনেছিলাম সেখানে ব্যাঘ্রদম্পতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিন্তু নিজের নিরাশ হয়ে আমাদেরও আশা ভরসা না দিয়ে চলে গেল। চিতা খুব চতুর ও শয়তান কিন্তু অনেক সময় ভীকর মতো ব্যবহার করে। আমাদের আসার আগে ঐ জায়গায় একটি চিতা খুব গরু মোষ মেরেছে কিন্তু ক'দিন এসে খোঁজ করেও তার সন্ধান পাইনি। নিরাশ হয়ে অচ্য ভালো জায়গায় যাওয়া ঠিক করছি এমন সময় সকালেই খবর পেলাম শিকারীরা তার টাটকা পায়ের চিহ্ন দেখেছে ও সেটা অনুসরণ করে একেবারে মৃত বাছুরের কাছে পৌঁছেছে, দেখা গেল চিতাটি সারারাত ধরে ভূরিভোজন করেছে। চিতাটি কুশাদ ছিল, শিকারীদের নানা জঙ্গলে দৌড় করিয়েছে। যখনই মনে হয়েছে এবার পাওয়া যাবে, কিন্তু তখনই সে পালিয়েছে। কখনও খোলা মাঠের উপর দিয়ে, পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে— সেখানে তার পায়ের দাগ পড়ত না। তার সন্ধান পাওয়া মুশকিল হল। শিকারীরা দূরে দূরে ঘুরে তবু কোনও চিহ্ন পেত। শিকারীদের ঘোরাঘুরি দেখলে সাধারণ লোক ভাবতে পারে মিছামিছি ঘুরছে—কিন্তু যারা এ বিষয় কিছু জানেন, বোঝেন এ ঘোরা বৃথা নয়। এ শিকারীরা ঠিক জানে কোন জায়গায় পায়ের ছাপ দেখতে হয় বা কি সংকেত দেখে তাদের গুহা কোথায় বুঝতে পারে। আমরা ভোরেই সন্ধানে বেরোই কিন্তু বেলা দুটো পর্যন্ত কোনও খবর পাইনি। তারপর কতকগুলি শুকনো পাতা, ভেঙে পড়া কচি পাতা ও আধখানা খাবার চিহ্ন দেখিয়ে দিল, কোন ঝোপঝাড় সে চুকেছে। ঘাসবন ছাড়া ঘন জঙ্গলের ভিতর যাবার পথ থাকে না, যেখানে বাবা কম সে পথেই যায়। আঘাত পেয়ে অন্ধের মতো কাঁটাবনেও ঢোকে, তা ভিন্ন এসব এড়িয়ে ঘুরপথে আসে যায়। বর্ষায় হয়ত গাছ পড়ে গেছে বা মাটি ধসে গেছে, তখন ওরা পুরনো রাস্তা ছেড়ে নতুন পথে যায় আসে। যাক এবার আমার গল্প শুরু করি। শিকারীরা ঐ ঝোপের দিকে এগিয়ে বুঝল যে চিতার বাইরে আগার পথটি বেশ ভালো। নিঃশব্দে তারা নিজেদের জায়গা বেছে দাঁড়াল। কোন দিক থেকে চিতা বেরোবে জানা ছিল

তাদের। সেই ভাবেই তারা তাড়া দিয়ে বের করবে, শিকারে নিরাশ হতে হবে না।
সেখানে বড় বড় গাছ ছিল ও কাছাকাছি ঘন কাঁটাভরা বেতবন, ঝোপঝাড়ও
ছিল। গাছের পিছনে বসে আমি সব গলিপথগুলি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম।
হাঁকা আরম্ভ হতে না হতেই চিতাটি বেরিয়ে এল। বুঝতে পারিনি কেন, বলতে
পারি না কেন কিন্তু হয়ত মাহুঘের গন্ধ পেয়ে বা আমার বন্দুকের নলটি দেখতে
পেয়ে গাছের পিছনে দাঁড়াল। আমি খালি তার ঠোঁটের উপর গোঁফের ওঠানামা
ও লেজের ঘন নরম লোম দেখতে পাচ্ছিলাম। অলক্ষ্য অপেক্ষা করেছিলাম।
বিহ্যৎ বেগে সে পালান, আমিও তাকে কাছ থেকে মারব ভেবে কোনাকুনিভাবে
দৌড়লাম। বলতে গেলে খুবই কাছে এসে পড়েছিলাম, বেশী রকম কাছে—গুলি
উপর দিয়ে চলে গেল কারণ সেই সময় চিতাটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে—পালাতে
পালাতে। আমি বন্দুকের নল দিয়ে ছুঁতে পারতাম প্রায়। আরও আশ্চর্য, দৌড়ে
পালাবার সময় হঠাৎ থেমে যেতে পারল কি করে। আরও আশ্চর্য যে আমাকে
আক্রমণ না করে—তার স্বাভাবিক ক্ষিপ্ততায় সাপের মতো গোল পাকিয়ে গাছের
পিছনে গিয়ে তখনকার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। বিপিন, আমার সবচেয়ে সেরা
শিকারী কাছেই লম্বা বল্লম হাতে দাঁড়িয়েছিল—তবে আমার দুঃসাহস দেখে ভয়
পেয়েছিল—কিন্তু ছেড়ে চলে যায়নি—ও তখনই বাঘ যে পথে গেছে সেদিকে নিয়ে
চলল। বনের পথ আমার চেয়ে তার বেশী পরিচিত। সে ডাক দিয়ে শিকারীদের
আনতে একটু দূরে গেছে—তখন আমি দেখলাম বেতবনের মধ্যে কি যেন নড়ল
ও তারপর চিতার পিঠের অংশ দেখে বুঝলাম সে এগিয়ে আসছে। আমি, সে
কয়েক ফুট এগিয়ে না আসা পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বন্দুক তোলার
শব্দটুকুতেই সে মুখ তুলে চাইল—আমিও গলায় গুলি করলাম। সেখানেই সে
তৎক্ষণাৎ মরে পড়ে গেল। এ বাঘটার ‘ঘুংগুং দেহি’ ভাব ছিল না, সাহসও ছিল
না। আমি তার ভীক ব্যবহারের কিছুই বুঝলাম না। সে যে পেট পুরে ভোজন
করেছিল সে জ্ঞাতও কিছু ব্যাঘাত ঘটেনি তার আসা যাওয়ার—সে বেশ দূরে
দূরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। আমার দুঃসাহসিকতার দরকার ছিল না। জঙ্গল ছেড়ে
পালাবার উপায় ছিল না তার কাজেই আমার বসার জায়গা বদলে ও শিকারীদের
অল্প রকম ভাবে জড় করে হাঁকা শুরু করলেই হত—কিন্তু আমি অপেক্ষা করে
হয়রান হয়ে উঠেছিলাম। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দুঃসাহসিকতা দেখানো কখনো
কখনো প্রশংসা দেওয়া চলে—নইলে কিছুই লাভ হয় না। শিকারে যা
অন্যক্ষেত্রেও যার যতই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকুক কখনো ভুল করবে না,

বোকামী করবে না এ—হয় না।

আরেকটি চিতার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণের বিষয় বলছি। আমি তার পথের সামনে ছিলাম না, বন্দুক চালাইনি কিংবা কোনও রকমে উত্তেজিত করিনি, তাও সে অকারণে আক্রমণ করে। প্রথমে সে খড়ের গাদায় নদীর ধারে লুকিয়েছিল। ঘন বেতবনে মাথা ঢুকিয়েছিল কিন্তু শিকারীরা যখন বন পেটাতে শুরু করে তখন তার বিশাল শরীর দেখা যাচ্ছিল। একজন শিকারী বলে যে মাথা লুকিয়ে বোধহয় চিতাটি ভাবল আর কেউ তাকে দেখতে পাবে না। শিকারীদের তাড়া খেয়ে তাকে এগিয়ে যেতেই হল—তার পথ ঐ কাদাভরা নদীর পাড়ের ওপারে—তাছাড়া নীচেও কিছু বনজঙ্গল ছিল। আমার বসার জায়গা থেকে ছুটাই ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম—তবে এ স্থানটি নদীর ধার থেকে অনেক দূর—এর নামনে খোলা মাঠ—এখানে জন্তু পাখী তাড়াবার খড়ের মূর্তির মতো বসা উচিত হত না—নিরাপদও হত না। আরও কাছে ভালো আড়াল না পেয়ে একটা বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িলাম। একজন শিকারীর ব্যস্তসমস্ত হয়ে এক খাবলা মাটি তুলে ছুঁড়ে মেরে বাঘটা বের করার চেষ্টা বেশ দেখতে পেলাম। বাঘটি মুহূর্তের জন্তু নদীর তীরে দাঁড়াল—পিছনে ঘন সবুজ বেতবনে তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। শিকারীরা ঐ দিক থেকেই হাঁকা করে আসছিল তাই সেদিকে গুলি চালানো নিরাপদ নয় ভেবে স্তব্ধমতো স্তম্ভগের অপেক্ষায় ছিলাম। ইতিমধ্যে দেখতে পেয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করে লাফাতে লাফাতে আমায় তেড়ে এল। আমার শিকারে এ রকম ঘটনা কমই হয়েছে ও আমার নিজস্ব নিয়মমতো যতক্ষণ বন্দুকের সামনে শুধু আক্রমণকারী জন্তুটি না দেখেছি ততক্ষণ গুলি চালাইনি। বাঘ ভালুক চিতা আক্রমণ করলে যদি তাদের চেয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক তাহলে ভালো তা না হলেই লক্ষ্য ঠিক রাখা শক্ত। বিপদের সামনে ও প্রাণ-সংশয় জেনেও—তোমার লক্ষ্য যতই অব্যর্থ হোক না কেন অল্প ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব। আমি বন্দুক চালানো সংবরণ করে আছি—আরেক লাফে নলের উপর এসে পড়ত। আমি অমঙ্গলের হাত এড়ালাম ও আশ্চর্য হলাম, যখন সে আমার ডান দিক থেকে কিছুদূর গিয়ে গর্জন করে আমায় মুখ খেকাল। গুলি করলাম সেই সময়, কিন্তু গুলিটা বাঁশঝাড়ে লেগে বেকে গেল। অল্প গুলি চালাবার আগেই সে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। জানি না তার এ ব্যবহার শুধু ভয় দেখাবার মতলব ছিল, না আমার নিরপেক্ষতা দেখে চম্পট দিল ?

অনেকে বলে বাঘের দিকে নির্ভীকভাবে চেয়ে থাকলে সে ভয় পায়—আমি

কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করি না। বাঘ বা চিতার চোখের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক যা বৈহ্যাতিক শক্তি আছে—তা তুমি যতই দৃঢ় মনোযোগে দৃষ্টিনিবন্ধ কর সে শক্তি আসে না। উদাসীন ভাব দেখানো ও নিশ্চলভাবে বসে থাকা অভ্যাস করা ভালো। অনেক সময় ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। বিশেষতঃ এসব বিপজ্জনক হিংস্র জানোয়ারের সামনে আসতে হলে নির্ভীকতারও দরকার। কতবার আমার পাশ দিয়ে কত হিংস্র জন্তু চলে গেছে—এ সম্ভব হয়েছে কারণ আমি কিছুমাত্র ভয় পাইনি বা অঘণা আক্রমণ করব সে ভাবও দেখাইনি। ঘুরে দাঁড়ালেই যে বিপদ হবে তার কোনও মানে নেই—তবে চারিদিক দেখে ঠিক করার উপর নির্ভর করে। বাঘ বা চিতা এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে যে গুলি করার সুযোগ দেয় না। আমি তোমায় যে নির্দেশ দিয়েছি তা মেনে চললে তাদের সন্দেহ হবে না—আর তুমিও সময় মতো নিরাপদভাবে ও নিশ্চিন্ত মনে গুলি অব্যর্থভাবে চালাতে পারবে। যেখানে বিপদ সবচেয়ে বেশী সেখানে বাঘের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে যাওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ আমি তোমায় এ উপদেশ দিই। এ রকম হলে বাঘ ছ'রকম ব্যবহার করতে পারে—হয় সে পিছন ফিরে চলে যায় আর নয় তার রাস্তায় অনধিকার ঢোকার জন্তু তোমায় শাস্তি দিতে আসে। সে দৌড়ে যদি না আসে তাহলে বন্দুক তোলায় বা কোনও রকমে তোমায় দেখতে পেলে খমকে দাঁড়াবে—সে যতক্ষণ ঠিক কি করবে ভাবছে, মুহূর্ত দেৱী না করে গুলি করা উচিত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি করার প্রধান মুশকিল যে বুক লাগলে সব সময় মারাত্মক হয় না। সব সময় সে পাশ ফিরেও যদি দাঁড়ায় ও এমন জায়গায় গুলি করা যে প্রাণঘাতী হবে তাও সহজ নয়। অনেকটা অবশ্য দৈব বা ভাগ্য যা বল তার উপর নির্ভর করে। দেখ না যেমন গুলি তোমার কপাল ঘেঁষে গেল অথচ মরল পিছনের লোকটি। দুর্ঘটনার কবলে না পড়ে, নিজেকে কোনো বিপদে না পড়ে যদি কুড়ি-পঁচিশটি বাঘ মারতে পার—তাহলে ভবিষ্যতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পার। এ সময় অস্ত্রের সাহায্যের ভরসা করো না, নিজের উপর নির্ভর করতে শেখ।

বাঘ ভেড়ে এসেও অতি সামান্য কারণে পিছিয়ে গেছে। একবার আমি ও 'মো' দাদা একসঙ্গে একটা বাঘের উপর গুলি চালাই। সে গড়িয়ে আমাদের বাদিকের জঙ্গলে ঢুকল। দেখেও অনেক সময় ভুল ধারণা হয়। আমাদের গুলি সামনের মাটি ঘষে চলে গিয়েছিল, তার গায়ে লাগেনি। শুধু বারুদের ধোঁয়া ও বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দে ধাঁধা লেগে সে ও-রকম ব্যবহার করে। এ রকম অবস্থায় আগে

থেকে কিছু ঠিক করা যায় না। কিন্তু চিতাবাঘ যখন বেশী কাছে এসে পড়ে—
 এত কাছে মোটেই নিরাপদ নয়, তখন আগেই তাকে আক্রমণ করা ভালো।
 যদি কুঁকে বা দু-এক পা এগিয়ে গুলি চালাও তাহলে বাঘের আক্রমণ এড়াতে
 পারবে। সে সামনে কোনও বাধা চায় না আক্রমণ করার সময়। যদি তোমার
 সামনে গাছ বা বড় পাথরের ডিবি থাকে তাহলে কাছে থাকলেও সে দূরে আছে
 মনে করা চলে। ভালো জায়গা বেছে নেবার উপর সব নির্ভর করে। তাকে অত-
 র্কিতে লক্ষ্য করতে পারা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিন বছরে আমি আঠা-
 রোটি চিতা মারি, তার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম পনেরটি আমায় একেবারে
 দেখতে পায়নি। আমি যে কথা বললাম নিজে থেকে আক্রমণ করার বিষয়
 আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ঘটনাটি দেশের বাড়ির কাছেই হয়েছিল। একটি
 খোপের ধারে চিতা আসার দুটি পথ ছিল। আমি একটা বাঁশঝাড়ের পিছনে
 নিরাপদে বসেছিলাম। কোনো রকম অঘটন ঘটে পাবে মনেও আসেনি।
 আমার বসার জায়গায় কয়েক ফুট নীচে গভীর পুকুর, তার উঁচু পাড়ের ধারেই
 আরেকটি পথ ছিল এত সংকীর্ণ যে সেখানে পা রাখার জায়গা ছিল না—পা
 ফস্কাতে হাবুডুবু খেতে হবে। আমার শিকারীরা ও আমি এ পথটি নগণ্য বলে
 ধরে নিয়ে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে, সেখানেই একেবারে ধারে টুল রেখে
 বসলাম। সামনে কুঁকে পড়া বাঁশের উপর বন্দুক রেখে চালাবার সুবিধে হবে মনে
 হল। বাঘ তাড়িয়ে আনার সঙ্কেত দিলাম। আমার হাতী ‘মোহনলাল’ বেতবন
 পায়ে দলে এগিয়ে আসতে লাগল ঐ পাড়ের ধারে ধারে—শিকারীরা ওর ভিতর
 দিয়ে আসা নিরাপদ নয় বলে পিছনে পিছনে চলছিল। আমি সামনে কুঁকে—
 কিছু শব্দ হয় বা নড়ে দেখার জ্ঞান বসেছিলাম—হঠাৎ কিছু নড়ল, ফিরে দেখি মস্ত
 চিতা তিন ফুট নীচে থেকে উপরে আসছে। বন্দুক তুলতেই সে আমায় দেখে
 পালাল—ঐ ঢালু পাড়ের বাকি আড়াল পড়ায় আর তাকে দেখতে পেলাম না।
 আমি যত নিঃশব্দে পারি এগিয়ে, মাহতকে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম।
 চারিদিক থেকে বাঘটাকে জোর তাড়া দিতে শুরু করল। আমি বন্দুকের কুঁদো
 নীচু করে ধরলাম, ঘোড়াটা (trigger guard) ঠিক হাঁটুর উপর ছিল। বাঘটা
 আমায় আগেই দেখেছিল, তাই ভাবলাম এ পথ সে এড়িয়ে চলবে—তবু হঠাৎ
 যদি কিছু ঘটে সেজ্ঞান আমি সতর্ক হয়ে রইলাম। যতক্ষণ পারল সে লুকিয়ে রইল
 —হঠাৎ চক্ষের পলক ফেলার আগেই দেখি এক বলক হলদে কটাশে লোম।
 প্রায় তার মাথাটা বন্দুকের নলে ঠেকে যাচ্ছিল। * তাকে আক্রমণ করা ছাড়া

উপায় ছিল না—নলের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় সে আশ্চর্য হয়ে যায় এবং গুলি চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং করে জলে পড়ল—মাছ তোলার মতো করে তাকে জল থেকে বার করা হল। বাঘের আচার-ব্যবহার ও আমার বিচক্ষণতার বিষয় বললাম। ব্যাঘ্রদম্পতির তুলনা করা চলে না—নিন্দা করাও ঠিক নয়। তবে স্ত্রীজাতি আগে এসে ঝগড়া বাধায়—দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার অভিজ্ঞতা এই রকমই। সে শিকারীও বেশী ভাল—বাঘিনীর চোখে যে আগুন জ্বলে তা নিরতিশয় নির্দয় ও মন্দ।

১৯ শে ডিসেম্বর ১৯১৭

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

মোহনলালের বাঘ তাড়িয়ে বার করার স্মৃতিপূর্ণ সুন্দর কৃতিত্বের বিষয় বলছি। দাঁতাল হাতীর মধ্যে তার মেজাজ সবচেয়ে ভালো ছিল। শিকারের সময় সে খুব সতর্ক হয়ে থাকত। শিকারের পর দিনের শেষে বাড়ি ফিরতাম যখন সে সাফল্যের পুরস্কার হিসাবে তার প্রাপ্য আখ বা মিষ্টির বিষয় মনে করাতে ভুলত না। তাকে আদর করতে গেলে নানা রকম শব্দ করে মনের আনন্দ জানাত ও কোটের কোণা ধরে টান দিয়ে বোঝাত শুধু আদর করলে চলবে না—মিষ্টিও কিছু চাই।

ঘন বেতবন ছধারে ঢালু হয়ে নালার দিকে গেছে। শিকারীদের পক্ষে নালার পাশের এ পথ বিপজ্জনক ও কষ্টকর। একটি কুনুকা একদিকের নালার মধ্যে দিয়ে আসছিল ও অন্টদিকেরটিতে মোহনলাল হুমদাম করে পা ফেলে চলে আসছিল। শিকারীরা উঁচু জমির উপর লাইন করে আসছিল। দুটি নালা যেখানে মিশেছে ঠিক সেখানে বসেছিলাম তাই দুই হাতীর এগিয়ে আসা দেখতে পাচ্ছিলাম। মোহনলাল ধীরে সাবধানে গুঁড় বাড়িয়ে গুলদার মশায়ের খোজ দিচ্ছিল ও লাথি মেরে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি চারদিকে সশব্দে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এ সব বিপদের আভাসেও বাঘটা কিছুমাত্র চঞ্চল হয়নি। মোহন তার বিশাল খামের মতো পা যেভাবে তুলে আবার ফেলে এগিয়ে আসছিল—সে দৃশ্য দেখবার মতো। আমি একটু অর্ধৈষ হয়ে পড়ছিলাম তখনই দেখলাম মোহন একটা গাছের ডাল ভেঙে নিল। মনে করলাম ‘কি রে লোভী!’ কিন্তু বুঝলাম সে খাবার জন্ত ডাল ভাঙেনি। ডালটা ধরে ঘুরিয়ে সামনের ঝোপের উপর এমন জোরে মারল যে চিতাবাঘটা হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে আমার সামনে বেরিয়ে এল।

আমাদের প্রতিবেশীর একটি মস্ত দাঁতাল হাতী ছিল (বারা আমাদের দেশে পনের মাইল দূরে থাকেন তাঁদেরও আমরা প্রতিবেশী বলি) । এটি শিকারে তেমন পটু ছিল না কিন্তু খুব মারপিট করতে পারত । যখনই জমিদারীতে ভূমি নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হত তখনই আমার বন্ধু প্রতিবেশী জমিদারের পক্ষেই জয় হত । বিপক্ষের লাঠিয়াল কোশলে বা সাহসিকতায় যদি বা একটু এগিয়ে যাচ্ছে দেখতেন তখনই ‘কালীগজ’ গুঁড়ে প্রকাণ্ড বাঁশ ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে পাগলের মতো তেড়ে আসত । তার ঐ বাঁশের আঘাত লাগলে দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হতে হত । ঐ কালীগজ আজ নেই । তার ঐ অসং উপায়ে জীবিকানির্বাহ বিষয়কর । তার নিশাচর বদ-অভ্যাসের জন্য জমিদারকে অনেক অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে । আখের প্রতি পক্ষ-পাতিত্বের জন্য তার কুখ্যাতি ছিল । একবার এই হাতীটি আমার বন্ধুকে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে সে কথা না বলে পারছি না । অনেক দিন আগের কথা, আমরা সারাদিনের শ্রান্তির পর তাঁবুতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি । এটা ক্রিসমাসের (X'mas) সময় । ভোর রাত্রে বন্ধুর আর্তনাদ ও চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল । প্রথমটা ভাবলাম বোধহয় ভূমিকম্প হচ্ছে । অল্পক্ষণ পর হাতীর পায়ের আওয়াজ পেলাম । তারা কোনো রকমে খুলে গেছে ও দৌড়ে বেড়াচ্ছে । পাচটি হাতীর মধ্যে কালীগজও ছিল । তার নিতানৈমিত্তিক অভ্যাস মতো শিকল ছিঁড়ে রাত্রে আখ ও অল্প খাদ্য খুঁজতে বেরিয়েছিল । তার দেখাদেখি অন্যগুলিও বেরিয়ে এসেছিল । আমাদের শিবিরের পাশ দিয়ে সশব্দে চলে গেল । আমার বন্ধুবর মনে করতেন জজেরা যে পরচুল (wig) পরে মাথায়, তারা শাস্তিতে ঘুমতে পারে না । নিজের মাথা রক্ষা করতে ও হাইকোর্টের পতন না হয় দেখতে তিনি চিৎকার করেছিলেন এবং হাতীগুলো চলে গেলে তখন চুপ করলেন ও উদ্বিগ্নতার শেষ হল । আমার ঘুম ভাঙেনি বলে ঠাট্টা করলেন—কিন্তু যখন জানি যে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই তখন শীতের রাতে গরম কব্বল ছেড়ে কে উঠবে ?

যে লোক হাতীকে না ভালবাসে হয় সে দেবদূত না হয় নেহাত সাধারণ মানুষ । আমি হাতীকে অপরিমীম ভালবাসি যে অবাধে তার গল্প বলতে শুরু করলে থামতে পারব না, শেষও হবে না । নেহাত পাগলা হাতী হলে বা আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া হাতী মারার ইচ্ছে নেই । এ হত্যার পাপ করবো না । আমার এ ভালবাসা গোপনে মনের কোণে রেখেছি ও মাঝে মাঝে সন্মুখে এদের কথা বলে এ অহুরাগ দীপ্ত করে রাখব । এখানে এ কথা বলা বোধহয় অবাস্তব হবে না যে ঘটনাটি কটকের জঙ্গলে ঘটে । আমরা তিনজন—চৈত্রমাসের প্রভাতে

‘হাতী পাহাড়’ বলে যেটাকে সেই পথে এগিয়ে চলেছিলাম। বেশীর ভাগ শিকারীর দল পাহাড়ের অপর দিকে পৌছেছিল। আমরা জনকতক অচুচর সঙ্গে নিয়ে বন্দুক চালাবার জন্য ভালো জায়গায় যাচ্ছিলাম। এখানে ওখানে বাঘের পায়ের দাগ দেখলাম। হাতীর দল যে সম্প্রতি ঐ পাহাড়ের পথে গেছে তাও বুঝতে পারলাম। তাদের ছোট বড় পায়ের দাগ ছিল। এখানে একটা ভাঙা বাঁশ, ওখানে একটা ডাল ওপড়ানো দেখে তারা কোন পথে গেছে জানিয়ে দিচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের কাছাকাছি এলাম কিন্তু প্রায় সবগুলি নীচের উপত্যকায় ঘন বাঁশবনের ভিতর ছিল। তারা যে অনেকগুলো সেটা তাদের কলরবেই বোঝা গেল। তাদের এই উপস্থিতির জন্য বাঘ তাড়িয়ে বের করা বিপজ্জনক হবে কিনা এ প্রশ্ন উঠেছিল। বাইসন বা গৌর ছাড়া অল্প জানোয়ার হাতীর দলের সঙ্গে থাকে না। এদের চলাফেরা দেখে অল্প জন্তু ভীত হয়। গুলির শব্দে হয়ত এরা ছড়িয়ে পড়বে তাই গুলি ছোঁড়া ঠিক হল। কিন্তু হঠাৎ কিছু করার আগেই বিস্ময়করভাবে গুরু গুরু শব্দে সমস্ত পাহাড় নড়ে উঠল, গাছপালা কঁপে উঠল, পাহাড়ের ভিত্তি কাঁপিয়ে সশব্দে ভূমিকম্প শুরু হল, যেন প্রলয়কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। পাথর ও পাহাড় ভাঙা বড় বড় পাথরও গড়িয়ে আসছিল। বাঁদরের দল ও হরিণের পাল ভীত হয়ে ইতস্ততঃ যে যেখানে পারল দৌড়ে পাহাড় থেকে নীচে নামতে লাগল। পাখীর ভীত ডাক ও কীটপতঙ্গের ঝিঁঝিঁ রব সমস্ত জঙ্গলটি ভয়াবহ ও অস্বাভাবিক করে তুলেছিল। নীচের উপত্যকায় হাতীর দল ভেরী-ধ্বনির মতো হুস্কার করে যেন আতঙ্কিতভাবে পালাতে লাগল। অল্প জন্তুগুলি জঙ্গল ছেড়ে খোলা জায়গায় যেতে পারলে যেন বাঁচে। হয়ত এ ঘটনা এক মিনিট বা তার চেয়ে অল্প সময় হয়েছিল—ঠিক কতক্ষণ মনে নেই—তবে যতটুকুর জন্তুই হোক আমাদের বেশ উদ্ভিগ্ন করে তুলেছিল। এই অদ্ভুত ঘটনা পুনরায় হবে বলে মনে হয় না—এ কি ভীষণ দৃশ্য ও কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমাদের শিকারের আশা ভরসা সেদিনের মতো মাটি হয়ে গেল প্রকৃতির ঐ অবোধা লীলায়। আমরা ধীরেস্থে শিবিরে ফিরে এলাম।

আবার গল্প শুরু করছি। চিতাবাঘ শিকারে যদি আগেই তাড়া খেয়ে থাকে তো আরও চতুর হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখেছি এরা অতি সামান্য জঙ্গলে চূপ করে লুকিয়ে থেকেছে। যারা জঙ্গল পেটায় তাদের হাত এড়াবার জন্য ও কোনও রকম শব্দে তাদের সন্দেহ হলেই পালায়। যদি সে কোথায় লুকিয়েছে জানতে পার তাহলে হাঁকা করার সঙ্গে ত দেবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ দ্রুতগতিতে পালায়। তারা

যে জায়গায় জন্তু মারে তার অনেকটা দূরে গিয়ে বসে, এ কৌশলে তারা অনেক সময় শিকারীদের এড়িয়ে যেতে পারে।

একটি প্রকাণ্ড গুলবাঘের নাম আমরা 'ভিজ়ে বাঘ' (De Wet) দিয়েছিলাম। সে আমাদের নাকের সামনে আমাদেরই গ্রামে বহুজানোয়ার হত্যা করে। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাইনি—প্রত্যেকটি ঝোপঝাড় দেখে আশা হত হয়ত এখানেই আছে। এমন দিন যেত না যেদিন সে একটা না একটা জন্তু মারেনি—কখনো কাছাকাছি, কখনো বা দূরে হত্যা করত। আমরা অনেক স্বযোগ হারিয়েছি। সে আমাদের এমন হয়রান করে নাচিয়েছিল যে সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে ঠিক করলাম তাকে যেমন করে হয় ধরতেই হবে। আমার ওখানে থাকার শেষ দিনে তাকে পেলাম। কয়েক মাইল গ্রামের জঙ্গলেই তাকে পাওয়া গেল। সকালে রাখালরা যখন গরুর পাল নিয়ে বেরিয়েছে তখনই তার গর্জন শোনা গেল। অচ্য গ্রামে জীবহত্যা করে সে মাঠের উপর দিয়ে প্রায় এক মাইল চর পেরিয়ে ভোরের আলোর আগেই জঙ্গলে ঢুকে আশ্রয় নেয়। এ জঙ্গলটি মস্ত বিলের ধারেই ছিল—চারদিকে ঘন বেতবন। তার গর্জনে গরুর পাল পালান। সম্ভবতঃ বুনোশুয়ার তাড়াবার মতলবে এত হাঁকডাক। যদি মুখ বুজে থাকত তাহলে কিছুতে সন্ধান পেতাম না। যে খোলা মাঠ দিয়ে সে এসেছিল সেটা একেবারে শুকনো—তার গতিবিধির চিহ্ন কিছুই পড়েনি। যেখানে সে আশ্রয় নেয় তার পাশে প্রকাণ্ড ঝিল—উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এবং পাড়গুলো বেশ উঁচু ও ঘন বেতবনে ভরা। এখানে গরুর পাল চরতে আসত, তাদের ক্ষুরের দাগ ছিল—সেখানে বাঘেরও খাবার চিহ্ন দেখা গেল ভিজ়ে মাটিতে। বেতবন একেবারে জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল—আর বাঘটি শুকনো জায়গা ছেড়ে এর ধারে ধারে চলেই বনে ঢোকে। আমি একটি তেঁতুল গাছের নীচে বসলাম—জায়গাটি খুব নিরাপদ মনে হয়নি, অগত্যা ভালো জায়গা না পেয়ে ওখানে ছোট ডালপালা ভেঙে সামনে রেখে আড়াল করলাম—ছোট ডাল ও পাতা ছিঁড়ে ফেলি যেন বন্দুকের তাক ও আমার দৃষ্টিতে বাধা না হয়। ছুটি হাতী ও শিকারীরা পূর্ব-পশ্চিমে লাইন করে বন পিটিয়ে এগোচ্ছিল। হাতীর হুক্বারে বুঝলাম বাঘ ওখানেই—তবু খোলা মাঠে বেরিয়ে আসতে বেশ সময় নিল। তার বেরিয়ে আসার ঘন তাড়া ছিল না বা মাঠ পেরিয়ে যাবার কোনো ব্যগ্রতা ছিল না। সে যতটা উঁচু তার চেয়ে বেশী দেখাচ্ছিল—তার সোনালী রঙ আলোয় ঝলমল করছিল ও প্রতি পদক্ষেপে তার সুন্দর স্তূঠাম দেহের পূর্ণ যৌবনের সুস্পষ্ট প্রকাশ বুঝিয়ে দিল।

তার ঐ ধীর মহুর গতি ও সর্বাঙ্গ সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল তাই কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে দেখছিলাম। গুলি ছুঁড়িনি, তবে লক্ষ্য স্থির করে কাঁধের নীচে গুলি করতেই সে পড়ে গেল। তবু আরেকটি গুলি করলাম যাতে সাংঘাতিক ভাবে লাগে। এত কাছে ছিলাম যে দ্বিতীয় গুলি মারা দরকার—বিশেষতঃ খোলা মাঠে। অনভিজ্ঞ শিকারী হয়ত মনে করতে পারে এটা অযথা অপব্যয়।

বড় জন্তু শিকারের আনন্দ অপ্রত্যাশিত সাফল্যের উপর নির্ভর করে—যেন সেটা টুপীর উপর পাখীর পালকের বাহারের মতো বাহবা দেখান। অনেক ক্ষেত্রে আমি নানাভাবে সংগ্রহ করেছি। অনেক সময় অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্য এত প্রশংসা পেয়েছি—যতটা পাওয়া অতিমাত্রায় হয়েছে তাও আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইনি। এখানে একটা ঘটনার বিষয় বলছি। ভোরে একটা চিতাবাঘ গরু মেরে চলে যায়—কোনোও রকম চিহ্ন রেখে যায়নি—কিছুটা খায়ওনি—তাই রাত্রে তার ফিরে আসার খুবই সম্ভাবনা ছিল। যারা সন্ধান করে তারা স্থম্পষ্টভাবে সে কোথায় লুকিয়ে বসে আছে কিছুই বুঝতে পারেনি। তাই মনে করলাম সারাদিন জঙ্গলটায় আর গোলমাল না করতে দেওয়াই ঠিক। সন্ধানকারী লোকেরা অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে গেল—আমি দিনের আলো হবার কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম যে মরা জন্তুর কাছে পথ ধরে তারা চিতাবাঘের খোজে সফল হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে খাবার আগে সে অনায়াসে দশ ফুট নালা একলাফে পার হয়েছিল কিন্তু গরুটি খেয়ে এত ভারী হয়ে গেল যে নালার জল হেঁটে পার হতে হল। জল তখনও বেশ ঘোলা ছিল বলে বোঝা গেল অলক্ষণ আগে পার হয়েছে। আমার বাঁয়ে প্রায় পিছন দিকে একটা লোককে (হিন্দীতে রোক বলে) গাছে চড়ালাম—বাঘ এ পথে এলে তাকে থামিয়ে অল্প পথে পাঠাবার দরকার হয় যদি। জঙ্গল পিটিয়ে লোকজন এগিয়ে আসছিল কিন্তু বাঘের কোনো খোজ নেই। ছোট্ট ছোট্ট পাখী যারা বনের বাইরে আসতে ভয় পায় তারা আমার প্রতি খেয়াল না করে কাছেই দু-একটা ছোট ডালে বসতে শাখাগুলি হুলে উঠল। আমি তাদের উড়ে আসায় মনে করলাম বাঘ বুঝি এসে পড়েছে কিন্তু পরে বুঝলাম কারণটা অল্প। জঙ্গল হাঁকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—‘রোক’টিরও কোনো সাড়া নেই—আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় ছোট্ট একটি পাখী ফুড়ুং করে আমার উপর থেকে উড়ে গেল। আমি আমার মোড়ায় ঘুরে বসতেই গজ তিরিশ দূরে তার গুলদার কোট বা জামা নজরে পড়ল—বন্দুক ঘুরিয়ে নিয়ে গুলি করলাম। কি যে হল কিছু বুঝলাম না। জঙ্গলও এত ঘন যে

আমার গুলির পরিণাম কি হল তাও বোঝার উপায় ছিল না। গুলির শব্দে হাঁকা বন্ধ হল—আমিও বন থেকে বেরিয়ে বাঘটি যে পথে গেছে সেগুলি দেখতে শুরু করলাম—কিন্তু কোথাও তার বাইরে আসার চিহ্ন নেই। ‘রোক’টি সেখানেই ছিল—সে বলল বাঘ এত নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছিল যে তার গাছতলায় আসার আগে কিছুই বুঝতে পারিনি। সে বুঝেছিল মুখ বুজে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। আগে যে জায়গায় তাকে এক নজর দেখতে পাই অতি সাবধানে সেদিকে এগিয়ে দেখি বাঘটা হুমড়ি খেয়ে বোঁচকার মতো পড়ে আছে। কানের ভিতর দিয়ে গুলি লেগে সে নিশ্চল পাথরের মতো মরে পড়েছিল। এ যেন ‘ভেকি ফাঁকি’, ‘ফসকে ফেসে বাণ’ লাগল, জিতও হল। হঠাৎ এ রকম সাফল্য আশাতীত।

সপ্তাহের ছুটিতে দেশের বাড়িতে গিয়েছি হঠাৎ সব মাটি হল। যে লোকটা আমার বন্দুক পরিষ্কার করে সে ভুল করে ৪৬৫ বন্দুকের নলটি না দিয়ে ৪৫০। ৫০০ বন্দুকের নল দিয়েছিল—ছুটি বন্দুক দেখতে একেবারে এক রকম, যেন সমজ। দোষ যে আমারও ছিল না তা বলা যায় না। প্রতিবার আমি নিজে সব দেখে নিই কিন্তু এবার তার উপর নির্ভর করেছিলাম। বাঘে গরু মেরেছে খবর এল—যাবার জন্য তৈরী হয়ে বন্দুকটি নিতে গিয়ে নির্বোধের এ ভুল আবিষ্কার করলাম। ছুঃখিত হয়ে ফিরলাম কিন্তু কিছুটা জ্ঞান হল।

প্রায় পনেরো দিন বাঘটি খাসা খুশী মনে গরু মোষ মেরে ঘুরে বেড়ালো। আমি আবার তখন সেখানে গেলাম—রাত্রে বুষ্টি হয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হল। যারা তার সন্ধানে ঘুরছিল তাদের কথায় বলি, “বাঘ তো আর আকাশে ঠ্যাং তুলে ঘুরে বেড়াবে না।” শ্রীওলাভরা খালের ধারে যেখানে বেতবন হয়ে পড়েছে—তার কাছেই তার খবর পেল অনায়াসে। তার জঙ্গলে নামার সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না তাই তাকে খালের ধারে ধারে তাড়া দিলেই হবে মনে হল। বাঘটা সে পথ ছেড়ে যায়নি, একটা গাছের শিকড়ের কাছে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে ছিল। যখন তার দুপাশে লোকজন আসে—সে দৌড়ে শ্রীওলা পেরিয়ে জলের ভিতর দিয়ে ওপারে দ্বীপে আশ্রয় নেয়। সেখানে এমন দৃঢ় হয়ে বসল যে তাকে বের করা বেশ কঠিন হল—তখন হাঁকাইরা ও মোহনলাল মিলে তাকে তাড়িয়ে বার করে। আমার ডান দিকের তার পালাবার পথটাই বেশী ভাল মনে হয়েছিল—কিন্তু আমার অনুমান ভুল হল, সে বাঁ দিকের পথ দিয়ে পালাল। বন্দুক তুলে গুলি করলাম কিন্তু ফসকে গেল, গুলি লাগল না। বেলা পড়ে এল, জঙ্গল অন্ধকার হয়ে এল। যদিও ছুঃখিত মনে ফিরি তবুও পরদিনের আশায় রইলাম।

জানি না নেহাত কৌতূহলবশতঃ হয়ত রাত্রে ঘুরে বেড়াবার সময়, আমি যে জায়গায় টুল নিয়ে বসেছিলাম সেটা শুধু দেখেই যায়নি, নথ দিয়ে মাটিও আঁচড়ে ছিল। নিজের সচরাচর চলার বেলা দূর থেকে চলে যায়। এটা কি নিজের বেপরোয়ায় অবজ্ঞা দেখান—ঠিক বুঝলাম না। এবারও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না—যদিও বেশী দূরে ছিল না। যারা খোঁজ করে তারা বাঁশবনের কাছেই তার পায়ের টাটকা দাগ দেখেছিল কিন্তু সে অতি সন্তর্পণে পালিয়েছিল। পরদিন সে তার বাড়ির কাছাকাছি এসেছিল কিন্তু প্রথমটা বন পিটিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। পরে আবার সন্ধান করতে করতে দেখা গেল জলচরের মতো বেশ বড় জলাশয়ের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উপরে আশ্রয় নিয়েছে। এরা এরকম আশ্রয়, আশ্রয়না গড়তে ভালবাসে। আমি একটা বাঁশঝাড়ের পিছনে বসলাম। সেখান থেকে দশ গজ দূরে মোড়ের মাথায় বাঘের যাবার ছুটি পথ ছিল। যদি সে আমার বাঁদিকের পথে আসে, তাকে পাশ থেকে বেশ নিরাপদে গুলি মারা যায় কিন্তু যদি ডানদিকের পথে আসে, তাহলে ঐ বাঁশের ভিতর থেকে মারতে হবে, তাতে সে হয়ত আমার বন্দুকের নলের গজখানেকের মধ্যে এসে পড়বে। খোলা জায়গা যেটুকু ছিল সেখানে সে দৌড়ে বেরিয়ে এল তবে আমার ইচ্ছামতো এল না—বাঁদিকেও গেল না। একটু দূরে বাঁশের আড়ালে তার ঘাড় ও মাথা দেখলাম—বন্দুক তোলার সামান্য শব্দ হতেই সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। নাকের উপর গুলি চালালাম—তাতেই তার ও আমার বোঝাপড়া শেষ হল।

আমার ভাগ্যের জোরে এখন পর্যন্ত দশবারের মধ্যে সাতবারের বেশী বাঘে আক্রমণ করেনি। চারবার আক্রমণ করতে এসেও—আমার গুলিতে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে ফিরে গিয়েছিল—তাই বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। আরেকটা এক লাফে আমার উপর এসে পড়ত—নীচে থেকে আমার দিকে আসার চেষ্টা করছিল—কাছ থেকেই তাকে গুলি মারি। স্তব্ধ ছিল কারণ আমি উপরে বসেছিলাম। সবচেয়ে বিপজ্জনক আক্রমণের বিষয় কিছু বলা দরকার। ঘটনাটি এই ভাবে ঘটে :

জঙ্গলটি বেশ ছোট ছিল। অনেকক্ষণ বন পেটানোর পর একটি বুনোশুয়ার দৌড়ে পালাল। তার ক্ষুরের দাগ চারদিকের মাটিতে দেখে, খোঁজ করে বোঝা গেল সে সারারাত ধানক্ষেতে তাণ্ডব-নৃত্য করেছে। কিন্তু ভোর হতেই তার বিশ্রামের জায়গা অন্যের দখলে দেখে, সে আক্রমণের পথ ছেড়ে পালিয়ে বুদ্ধির

পরিচয় দিয়েছিল। আমার শিকারীটির বয়েস অল্প হলেও খুব উৎসাহী ছিল। তার কথায় জায়গাটি পরীক্ষা করে দেখে বুঝলাম যে মস্ত একটি চিতাবাঘ শুয়োরের আগেই জঙ্গলে ঢুকে সেটি নিজে অধিকার করেছে। তাই শুয়োর যখন এ কথা বুঝল তখন সে বিপদে পড়ার অসন্তোষ এড়িয়ে পলায়ন করা শ্রেয় মনে করল। হবসন-এর (Hobson) মতের মতো এতেও আমার ছুটি কাজের নির্দেশ ছিল—হয় বাঘটি মারা নয় ছেড়ে দেওয়া। শেষটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ। তাই অতি সাবধানে টুলটি রেখে বসে বিপিনকে অন্ত শিকারীদের ডাকতে পাঠাই। তারা অল্প দূরেই অপেক্ষা করছিল, যেন শিকার চমকে না পালায়। কাছে একটি গাছও ছিল না বা লুকোবার মতো আড়াল করা ঝোপঝাড়ও ছিল না। যে বেতবনে বাঘটা ঢুকেছিল সেখান থেকে আমার কাছ অবধি নেহাত ছোট গুটি-কতক লতাগাছ ছিল। আরও কাছে বাঁশঝাড় ছিল, সেখান অবধি এগিয়ে গেলে বাঘটাকে উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করার সুযোগ দেওয়া হত। এ জায়গাটির তিন দিকে খোলা মাঠ ও তার পালাবার একমাত্র পথটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হলে তাকে প্রথম গুলিতেই সাংঘাতিক ভাবে আহত করে নিশ্চল না করতে পারলে শিকারীর পক্ষে বিপজ্জনক। আমার হ্যাট (Hat) বড় বেশী নজরে পড়বে ভেবে সেটা খুলে রাখি—যদিও অভ্যাস মতো হ্যাট মাথায় রাখতেই চাই তবে চিন (Chin) ষ্টাপটা খুলে দিতাম। আমার স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনার পর মনে হয়েছে হ্যাট রাখার অনেক সুবিধে। একবার আচম্বিতে একটা চিতাবাঘ বেরিয়ে টোকা মাথায় চাষীকে দেখেই এক থাপ্পড় লাগালে সে মাটিতে পড়ে যায়। সে শিকার দেখতে এসেছিল। বাঘে মালুষে এমন ফালগোল পাকিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল যে গুলি করা অসম্ভব হল। আমার চমক ভাঙার আগেই বাঘটা পালিয়ে যায়। আরও আশ্চর্য হলাম চাষীর কাছে গিয়ে তখন দেখি তার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি—তার টোকা আক্রমণের সব ধাক্কা সয়েছিল, তার মাথায়ও লাগেনি। আমি খালি মাথায় বসলাম—বিনা হ্যাটে কিন্তু ভাল লাগছিল না। হাঁকাইরা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল, দু-এক গজ এগোতে না এগোতেই খুব জোরে থড়মড় শব্দ হল, হয়ত শুয়োরটা আসছে যেমন আসে। কিন্তু ভুল বুঝলাম, দেখলাম, বাঘটা তড়িৎ বেগে বেরিয়ে পালচ্ছে। আমার গুলি ভালোভাবে লাগেনি। বাঁশঝাড় পেরিয়ে গিয়ে পড়ল কিন্তু মূহুর্তে উঠে বিদ্যেযুগ্ম গর্জন করে আক্রমণ করল যেন তার কিছুই হয়নি। আমি তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও বলতে পারি না—বাঘ যখন লাফ দিতে যাচ্ছিল বা এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন হয়ত বাঁ নলের গুলিটা

মারি। ঘটনাটি মুহূর্তের মধ্যে ঘটেছিল। তবে স্পষ্ট মনে আছে—আমার মুখে হাওয়ার ঝাপটা লাগল, দেখি বাঘটা হঠাৎ ডিগবাজী খেয়ে মাথার উপর দিয়ে হাত পাঁচেক দূরে আমার পিছনে গিয়ে ধপ্ করে পড়ল। সে চিং হয়ে পড়ে—মাথাটা আমার দিকে ছিল। দেখে মনে হল প্রাণ নেই তবুও তার দিকে যাবার আগে খুব সতর্ক হয়ে গুলি ভরে নিলাম। মনে হয় বুকে গুলি লেগে সে আগেই মরে গিয়েছিল তা নয়ত তার আক্রমণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল কেন বুঝলাম না। অনেক সময় হয়—মরে যাবার পরও মেরুদণ্ডের আক্ষেপের জন্য শূন্যে বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে অগ্নিদিকে পড়ে—এটা তার স্ব-ইচ্ছায় হয়নি। সব শেষ হয়ে গেলে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল আর শরীর শিরশির করে উঠল। একজন শিকারী দেখাল আহত বাঘের রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে আমার বাঁ পায়ের বুটজুতোর উপর পড়েছে। এ যাত্রা যে প্রাণে বেঁচে এসেছি তা বুঝতে দেরী হল না।

আমায় বহু লোক অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে যে হঠাৎ বিপদে পড়ি যদি, সেইজন্ত ‘রিভলভার’ নিয়ে যাই কিনা। কল্যাণ, আমি কখনই এটা সঙ্গে নিইনি বা নেবার কথা ভাবিনি। আমার মতে এটা বাধাই হয়, দরকার কিছু হয় না। সঙ্গে আমি সর্বদা একটা ছোরা রাখি তবে আশা রাখি কখনও সেটা ব্যবহার করার আবশ্যক হবে না। বাঘ বা চিতা এত তাড়াতাড়ি আসে ও এমন তড়িৎবেগে তাতে ছোরা বার করার সময় থাকে না। যদি দ্বিতীয় গুলি তোমায় না বাঁচাতে পারে আর কিছুতে রক্ষা করতে পারবে না। প্রথমতঃ তোমার সাহস ও কৌশলতা এবং তোমার ভাগ্য, এতেই তোমায় বিপদে রক্ষা করবে ও বিপদ এড়াবে। আক্রমণ অনেক সময় শুধু গর্জন ও ক্রুদ্ধ আফালন মাত্র—আর কিছুর নিদর্শন নয়।

মানুষ যেটা ভালবাসে সেই বিষয়বস্তু নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলে। চিতা ও বাঘের বিষয়—যে এত কথা বললাম আশা করি পাঠকরা শ্রান্ত হয়ে পড়বেন না—ও কিছু জ্ঞানলাভ করবেন। একবার একটা বাঘ না জেনেগুনে গুয়োর ধরার জালে লাফিয়ে আটকে মহা বিপদে পড়েছিল। এ ঘটনাটির কথা এখানে বলছি। আমার অল্ল বয়েস, স্কুল কলেজের গরমের লম্বা ছুটি হলেই আমি শিকারের জন্ত অন্বেষণ করতে শিখতাম। শিকারীদের সঙ্গে জাল নিয়ে ও বড় লম্বা বল্লম হাতে বুনো গুয়োরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম। বড় গুয়োর খুঁজে জালে আটকাতে মজা লাগত তবে তাতে বিপদের রেশ থাকত বলে আরও ভালো লাগত। জালগুলো ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চিতে বেঁধে জড়িয়ে অগ্নি দিকে বড় গাছে বাঁধা হত—ঠিক

যে পথে গুয়ার আসে সেখানে শিকারীরা তাড়া দিয়ে আনত। তাড়া পেয়ে জাল না ডিঙিয়ে তার মধ্যেই আটকে পড়ত—অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বলমধারী কাছেই থাকত—সে পালাবার আগে অব্যর্থ লক্ষ্য, দৃঢ়তা ও সাহসেই তাকে মারা শিকারীদের কাজ। দুবার আমি বেশ বিপন্ন হই। একবার একটা নালায় ডিগবাজী থেয়ে পড়ি—আরেকবার গুয়ারধাক্কা দিয়ে আমার মাটিতে ফেলে দেয়—ভাবছি এই আক্রমণ করল বুঝি—সেই সময় শিকারীরাও এগিয়ে আসছিল। গুয়ারটা অক্ষত দেহে ছিল বলে বোধ-হয় তার মনটা বদলে গেল এবং সে দৌড়ে দৌড়ে অত্ন দিকে চলে গেল—জালটাও কিছুদূর অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিল। জালের গিঁটগুলো সাবধানে শক্ত করে বাঁধা হয়নি, আলগা ছিল, তাই ছুঁদিক সহজে খুলে গেল, এটা বোঝা মুশকিল হয়নি।

একদিন একটা মস্ত চিতার অলুসন্ধানে যাচ্ছিলাম। আমাদের দুজনের কাছে বন্দুক ছিল কিন্তু বেরোবার পথ ছিল অনেক। তাই আমি এ পথে জাল বিছাতে বললাম। বাঘ আমার দিকেই আসছিল—বোধহয় আমার নড়তে দেখে সে পিছ-পা হয়ে পালাচ্ছিল—গুলি করলাম, তার পিছনের পায়ে লাগে। অল্পক্ষণেই তার ক্রুদ্ধ গর্জন জাল বাঁধা জায়গার দিক থেকেই এল—গিয়ে দেখি গুলদার বাঘটি জালে পড়ে মাছের মতো ছটফট করছে ও লাফালাফি করছে। জালটা প্রায় ছিঁড়ে আসছিল তাই তাকে বেশীক্ষণ সময় না দিয়ে কাঁধের উপর গুলি করলাম। তার আশ্বাসন ও গর্জন শেষ হয়ে গেল—চিরকালের মতো।

৫ই জানুয়ারী ১৯১৮

খ্রিস্টমাস (Christmas) বছরে শুধু একবার করে আসে। ইংলণ্ডে থাকার সময় ছাড়া সব ছুটিগুলি আমি জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে কাটিয়েছি। নতুন নতুন জায়গা ও শিকারের খোঁজে আমার সারা ছুটিটা আমি মধ্য ভারতের গভীর জঙ্গলে কাটাই। বাঘ শিকারে কিছু না কিছু ব্যাঘাত বা কিছু চেষ্টার ক্রটিতে শিকারে নিরাশ হতে হয়। সব সময় শিকারে সাফল্য ও শিকারীর জন্তু সুখশ্রুতি আনে না। তবে কখনো একজোড়া মস্ত সাঘর কিংবা এক-আধটা ভাল্লুক শিকার করে কিছুটা খুশী হওয়া যায়।

এ প্রদেশের ভাল্লুক খুব মজাদার আর বিপজ্জনকও বটে তবে যদি ঠিকমতো

শিকার করতে পার যথেষ্ট আমোদ পাবে। এদের চিতা বা বাঘের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না হলেও প্রাণশক্তি এদের ছুঁজনের চেয়ে প্রবল। তার চলাফেরা জবুথবু দেখালেও যতটা ধীর গতি মনে হয়, মোটেই তা নয়। সে খুব বেগে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নামতে পারে, তখন তার সামনে না পড়াই ভালো ও নিরাপদ। সে খুব বলশালী ও শক্তসামর্থ্য। আমি দেখেছি আহত হয়েও সে যতদূর চলে যেতে পারে বাঘ বা চিতার পক্ষে তা অসম্ভব। বাঘ আহত হলে সেখানেই পড়ে কিন্তু ভাল্লুক অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়ে মরেছে। আহত হয়ে পালাতে না পারলে সে যে রকম আত্ননাদ করে আমার ভালো লাগে না। একমাত্র শুয়োরই বীরের মতো মরতে জানে। বাঘ ও চিতা গুলি লাগলে হুঙ্কার করে ও আহত হয়ে পালাতে না পারলে গর্জে ওঠে। কিন্তু আহত ভাল্লুক যে ভাবে করুণ মড়াকান্না কাঁদে তার মতো জ্বরদন্ত জন্তুর পক্ষে সেটা পরম লজ্জাকর। এদেশের ভাল্লুক আলাস্কার (Alaska) ভাল্লুকের মতো প্রকাণ্ড আকার হয় না—তাও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল। কখনো সাত ফুট পর্যন্ত বড় হয়। তার দেহ ঘন কালো লোমে ঢাকা। কিন্তু লোমহীন নাকটি অনেক দূর থেকে দৃষ্টি-পথে আসে। সে পায়ের পাতা ফেলে হাঁটে তাই তার পায়ের দাগ অনেক সময় মানুষের পায়ের চিহ্নের মতো। ছাল ছাড়ালে তাকে শহরের বেশ মোটামোটা অবস্থাপন্ন বাড়িওয়ালার মতো দেখতে মনে হয়। সে খায়ও অত্যধিক পরিমাণে। এটি বেশ বিপজ্জনক ও সাংঘাতিক জানোয়ার। তার ঐ বড় বড় নখ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ও বেশীর ভাগ সময় মুখের উপর আক্রমণ করে। যে পরিস্থিতিতে বাঘ বা চিতা তোমায় ছেড়ে দিতে পারে—সেই অবস্থায় ভাল্লুক তেড়ে এসে বিপন্ন করতে পারে—বিশেষতঃ যদি তুমি নীচে থাক। মাথায় গুলি মেরে তাকে মারতে পারলেই হল। অনেকে মনে করে ভাল্লুক খাড়া হয়ে দাঁড়াবে ও তার বুকের—ঘোড়ার ক্ষুরের মতো সাদা জায়গাটিতে সহজে গুলি মারবে—সে অত ভালো মানুষ মোটেই নয়। শুয়োরের মতো এরও নাকের অল্পভব শক্তি বেশী। তাই যদি তুমি নাকে আঘাত কর সে ফিরে পালাবে।

ভাল্লুক আখ খেতে ভালোবাসে। একটু দূরে ও নির্জন জায়গায় আখের ক্ষেত থাকলে সেখান থেকে তাদের তাড়ানো চাষাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। এক ডিসেম্বরের শীতে ভোরবেলা অন্ধকার থাকতেই এক চাষার সন্ধান ডাকে ঘুম ভাঙল। সে অত্যন্ত কষ্টে রাতের পর রাত তার কুঁড়ে থেকে পাহারা দিয়ে ও চিংকার করেও এই মস্ত ভাল্লুকটাকে তাড়াতে পারেনি। তার বিক্ষোভ দেখানোতে একটুও কান দেয়নি—ফলও হয়নি কিছু। আমার শিবির থেকে ক্ষেতটি এত

কাছে যে ঢিল ছুঁড়লে লাগান যায়। আমি যখন পৌছলাম, ভাল্লুক মহাখুশীতে খাসা স্তম্ভিষ্ঠ আখ সশব্দে খেয়ে চলেছে। কয়েকজন লোক জড় করে তাকে তাড়িয়ে বার করা গেল কিন্তু বোধহয় আমার গন্ধ পেয়ে আমায় এড়িয়ে পাহাড়ের দিকে পালান। দ্বিতীয়বারও সেই রকম চালাকি করে অগ্নি পাহাড়ে পালান কিন্তু যখন সেখান থেকে লাফিয়ে নামছিল তখন তার ঘাড়ে গুলি লাগায় নিঃশব্দে নালায় পড়ে মরে গেল। তার ছান ছাড়াবার সময় পেট চিরে দেখা গেল কণ্ঠনালী পর্যন্ত আখে ভরা।

আহারে সে সাত্বিক প্রকৃতির। প্রধানত ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত। তার পক্ষে উই খুব মুখরোচক খাদ্য তাই মাটি খুঁড়ে বের করে খেত। ষ্রাণশক্তি এত বেশী ছিল যে কোথাও মোচাক আছে জানতে পারলে নির্মমভাবে ভেঙে মধু খেত। খবর এল একটা ভাল্লুক কাছে উঠে মোচাক ভেঙে মধু খাচ্ছে—কিন্তু আমি পৌছে তাকে দেখতে পেলাম না। পরে দেখি সে নালায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে ও গৌড়াচ্ছে এবং মরিয়া হয়ে নখ দিয়ে শরীরের লোম আঁচড়ে মোমাছি বের করছে। আমি এজন্য তার খুব কাছে যেতে পারলাম। মারা পড়ার পর দেখলাম মোমাছির কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য, কাদায় গড়িয়ে শরীরের সবটা মাটির আবরণে ঢেকে নিয়েছিল।

আমি যতটা জানি ভাল্লুকরা মাংসাশী নয়—তবে নেহাত দায়ে পড়লে মাংসও খায়। শুনেছি দার্জিলিং অঞ্চলে প্রতি বছর এরা অনেক গরু মোষ মারে। মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারায় ছুটি ভাল্লুকের অদ্ভুত আচরণ আমার চোখে পড়ে। সে কথা এখানে বলছি। ১৯১৬-র ইস্টারের (Easter) ছুটিতে আমি ও সেখানকার জঙ্গলের অফিসার একই শিবিরে ছিলাম। সকালে খবর আসে জঙ্গলের বাংলা থেকে সিকি মাইলের মধ্যে বাঘ গরু মেরেছে। সেখানে গিয়ে ছুটি চিতাবাঘের পায়ের দাগ দেখি, তারা ঐ বলদের খুব কম অংশ খেয়েছে। বেশ নিরাশ হলাম কারণ বুনো কুকুরের দল (সোনা কুতা, হিন্দী নাম) জঙ্গলে এসে পড়ায় বাঘ সাধারণ হরিণ প্রভৃতি জানোয়ার অগ্নত্র চলে গেছে। আর কিছুই করার ছিল না। তাই ঠিক হল সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ অন্ততঃ শিকারের অপেক্ষায় বসব। রাস্তার ধারে যেখানে মরা বলদটি পড়ে ছিল তার পশ্চিমে মস্ত জলাশয় ছিল। ফুল ও ফলে ভরা মহুয়া গাছে মাচা বাঁধা হয়। সেখানে বসে তার গন্ধে নেশা না হলেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল। রাত আটটায় আমার ডান দিক থেকে একটি ভাল্লুক ‘হফ্, হফ্’ শব্দ করতে করতে জলাশয়ের দিকে চলে গেল। অন্ধকার রাত, আন্দাজে মনে

হল ভালুকটি আমার পিছন দিকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর শুকনো পাতার উপর দিয়ে যেন জন্তুটা আমার ডান দিকে এলো—মনে হল হঠাৎ হয়ত বাঘ এসে পড়েছে—কিন্তু এ তো তার মথমলি পায়ের নরম শব্দ নয়—যদিও বড় জানোয়ারের ভারী পদক্ষেপ। তার চলাফেরার শব্দ পাচ্ছিলাম কিন্তু কিছুতেই সে মরা গরুর দিকে এগিয়ে আসছিল না—তার সতর্কতার কারণ কি ভেবে আরও বিস্ময় বেড়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ সময় গেল—গাছের আড়ালে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সময় যেন শেষই হচ্ছে না। রহস্য গভীর হতে লাগল—সব আশা ছেড়ে দিতে হবে মনে হচ্ছিল। এমন সময় একটা মস্ত জন্তু বলদটির উপর গিয়ে পড়ল। তার ঐ ঘন কালো রঙ দেখে ভুল করার কোনও কারণ ছিল না। খুব জোরে সে দড়ি টানল কিন্তু দড়ি এত শক্ত করে বাঁধা যে ছিঁড়তে পারল না বরং তাকেই এমন চমকে দিল যে সে গরুর গাড়ি চলার রাস্তায় লাকিয়ে পড়ল। তারপর আর দেবী না করে সে বারবার মরা জন্তুর উপর পড়ে। সেটা টেনে নিয়ে যাওয়া বুঝা চেষ্টা বুঝল। তার এই টানাটানি এক্ষেত্রে হয়ে ওঠায় আমি প্যারাডক্স (Paradox) বন্দুক চালানাম—গুলি থেয়ে সে পড়ে গেল। কিন্তু উঠে বাসে ঢাকা জলাশয়ের দিকে অদৃশ্য হল। মনে হল আমার দ্বিতীয় গুলি ফসকেছে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই দেখে সন্ধেতের বাঁশী বাজানাম। লোকজন আলো নিয়ে এল—আমরা বাংলোর দিকে চললাম। আমার বন্ধু বন্দুকের আওয়াজ শুনে কি হল জানাবার জন্য এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। কিন্তু সকাল হবার আগে কিছুই করার নেই। সকালে যা জানা গেল তা বেশ আশ্চর্য করে দেয় আমাদের।

আমরা খুব ভোরে উঠে সেই জায়গাটির সন্ধানে চললাম। বন্ধুবার আরেকটি ভালুকের নতুন পায়ের দাগ দেখলেন। সে জলাশয়ের দিক থেকে মরা জন্তু খাবার চেষ্টায় এসেছিল। বন্ধু বললেন হয়ত আমার দ্বিতীয় গুলিটা ফসকেছিল। মৃত জন্তুর হাড় কখানি ছাড়া কিছুই ছিল না। আমার মারা ভালুকটি যেদিকে পড়েছিল সেদিকে গিয়ে দেখি—মাটিতে খুব রক্তের দাগ—দেখে খুশীই হলাম। তখন ফরেস্ট অফিসার ও আমি ঐ দাগ অনুসরণ করে দেখলাম এ দ্বিতীয় জন্তুটি সম্পূর্ণ অল্প দিকে গেছে। কাছের নালায় তার খাওয়া চারিদিকে ছড়ানো ছিল। মনে হয় বহুবার ঐ মৃত জন্তু থেকে মাংস এনেছে। সম্ভবতঃ সে এরকম করে, চিতা বাঘের হাত থেকে রক্ষা করে নির্বিঘ্নে আহারের ইচ্ছায়। আমরা তারপর অল্প ভালুকটির রক্তের দাগ অনুসরণ করে চললাম। সে ধীরে চলে গেছে, মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে থেমেছে, সেখানে অনেকখানি রক্তের দাগ। ওখানে শিকারী ও

আমি বেশ কিছুক্ষণ সন্ধান করলাম। ক্রমে রাস্তা বেশ কাঠিন ও গুহাপূর্ণ হয়ে উঠল। তাই দেখে আমরা তার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক বলে ছেড়ে চলে এলাম। মনে হয় আমার প্রথম গুলি বেশ উপরে লেগেছিল। রাতের অন্ধকারেও কালো চার ইঞ্চি পুরু লোমে এটা ঘটে—দু-এক ইঞ্চি নীচে হলে ঠিক হত। আমার বন্ধু ফরেস্ট অফিসার জঙ্গলে ঘোরেন। ঐ তাঁর সারা জীবনের কাজ কিন্তু এর আগে এমন মাংসাশী ভাল্লুক দেখেননি।

ভাল্লুক তার বাচ্চাদের পিঠে নিয়ে বেড়ায়। আর যদি একটিমাত্র থাকে তো এমন চিপকে মিশে থাকে যে দৃষ্টিতে আসে না। অল্পদিন আগে আমার এক বন্ধু একটি ভাল্লুককে মাচার উপর থেকে গুলি করেন। সে তখন দৌড়ে পালাচ্ছিল। মরে নালায় গড়িয়ে পড়ল। তখন দেখা গেল একটি নয় দুটি, দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন। প্যারাডক্স-এর গুলিতে মা ও ছানা দুজনেই প্রাণ হারায়—গুলি দুটি দেহ ভেদ করে। এ রকম স্থলে 'Double' দেখা বা 'To see Double' মার্জনা করা যায়।

এ যাত্রায় বেশ একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে। কিন্তু এটা বেশ বিপজ্জনক হতে পারত। হাঁকায় প্রকাণ্ড রাক্ষসের মতো একটি ভাল্লুক পাহাড়ের গা বেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল। আমার *৪৬৫ বন্দুকের গুলি কাঁধে লেগে এড়া ভাবে বাঁ দিকে গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। বড় একটা পাথরের পিছনে সে পড়ে গেল। আমি মনে করলাম আমার গুলিতেই কাজ হল শেষ। এমন সময় দ্বিতীয় ভাল্লুক আমার বাঁ দিকে দেখা দিল। পথ বেশী দূর না হয় এমন করে যেতে গিয়ে চিং হয়ে পড়লাম—আশ্চর্য, হাতে বন্দুক ছিল—আচমকা গুলি চলেনি, রাইফেলের কিছুই ক্ষতি হয়নি—বিশেষতঃ 'Holand and Holand'-এর বন্দুক ছিল বলেই তা হয়নি। ক' সেকেন্ড সরষেফুল দেখলাম, তারপরই উঠে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চললাম গুলি চালাতে। ভাল্লুকটা বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। এতটা যাবে ভাবিনি আর আমার গুলি ঠিকভাবে লাগবে কিনা ভাবছি কিন্তু দৈবে তাও হল। ভাল্লুকটা মরে পড়ে গেল দেখে নিজের পড়ে যাবার ব্যথাও যেন দূর হল। এমন সময় বন্ধুর দিক থেকে দুটি গুলির শব্দ পেলাম। ঘুরে দেখি যারা আমাদের বর্ধাতি ইত্যাদি নিয়ে অপেক্ষা করছিল তারা 'ভালু' তাড়া করেছে বলে চিংকার করে প্রাণভয়ে নানা দিকে দৌড়ছে। পিঠের ব্যথা বেড়ে চলেছে তাই ইচ্ছা নব্বৈও যথেষ্ট জোরে দৌড়তে না পারলেও দৌড়ে গেলাম। দেখি ভাল্লুকটার অবস্থা আমার চেয়ে শোচনীয়। আমি গুলি মারতে যাব, এমন সময় সে হুমড়ি খেয়ে আমার সামনে

পড়ে গেল। প্রকাণ্ড মাথাটা যেন বিশাল শরীরের নীচে পুঁতে গেল—যেন একরাশ নিশ্চল লোমের বস্তা। ইতিমধ্যে যারা নিরাপদ হবার চেষ্টায় গাছে চড়ে-ছিল, তাদের নীচে নামার জন্য বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। অনেক সাধ্য সাধনার পর—ইটপাটকেল ছুঁড়ে ও লাঠির গুঁতো দিয়ে মরেছে পরীক্ষা করার পর তবে কাউকে কাছে যেতে দিলাম। ভাল্লুকটা যাবার সময় আমার বন্ধুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ও একটি গুলি তার পাজরে লাগে এবং অণ্ডটি পিছনের পায়ে—তা সত্ত্বেও সে আমাদের পিছনের লোকগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একজন তো বন্ধুর জলের বোতল তার সামনে ফেলে প্রাণ বাঁচায়। ভাল্লুকটা সেটা তৎক্ষণাৎ যেন ছেঁ। মেরে তুলে নেয় কিন্তু বুকে ধরে রাখার, বেশী ক্ষতি করার তার শক্তি ছিল না। বোতলের কাপড়ের ঘেরাটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। মানুষটি ভাল্লুকের হাত থেকে বাঁচল বটে কিন্তু পাগলের মতো পালাবার সময় পাথরের উপর পড়ে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। ভাল্লুকটি প্রকাণ্ড ও খুব শক্তিশালী ছিল তা বেশ বোঝা যায়। সে গুলি খেয়ে পড়ে প্রথমবার তারপর একশ গজ গিয়ে Paradox-এর গুলি ভালভাবেই পাজরে লাগে এবং পিছনের পায়েও গুলি লাগে। তাও ঐ অবস্থায় সে লোকেদের তাড়া করে ছিন্নভিন্ন করে। রাফসের মতোই সে প্রকাণ্ড ছিল—এ রকম বিপুল আয়তনের ও শক্তিশালী ভাল্লুক আমি দ্বিতীয় আর দেখিনি।

শিকারী সব সময় জন্তুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়। একবার খুব দুর্গম স্থানে আমারই পশ্চাৎধাবন করেছিল। আমরা রেল স্টেশনের মাত্র পনের মাইল দূরে ছিলাম কিন্তু পথটি এত বন্ধুর ও দুর্গম যে শিবিরে পৌঁছতে প্রায় দশ ঘণ্টা লেগেছিল। পাথরে ভরা পাহাড়ে রাস্তায় রাত্রে যেতে গরুর গাড়ির মতো পরম জয়ন্ত যান আর কিছুই হতে পারে না। একদিন সকালে একেবারে বিবর্ণ ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত একটি যুবক তার পথপ্রদর্শকের সঙ্গে হাতে থলি নিয়ে এসে উপস্থিত হল। দৃষ্টি অদ্ভুত—কি উদ্দেশ্যে এসেছে তা জানতে সকলেই কৌতূহলান্বিত। বেচারী তার ভাই দুয়ারসের (Douars) প্রদেশে বিপদে পড়েছে, তাই আমি এখানে আছি জেনে অহুসন্ধান করে তার ভাইয়ের উদ্ধারের জন্ত আইন ব্যবসায়ী আমায় কাজে নিযুক্ত করাই তার অভিপ্রায়। আমরা তাকে খাইয়ে-দাইয়ে স্বাভাবিক করি। তারপর সে তার বক্তব্য শুরু করল। গাছের ছায়া চুরির জন্ত কোনও লোককে দণ্ডিত করতে পারা বিশেষ ও খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ অদ্ভুত ঘটনা রাজধানীর অল্প দূরেই ঘটে। কিন্তু Douars-এ যারা ফৌজদারী

মামলার বিচার করেন, অপরাধ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বিষয়কভাবে অভূত। এ লোকটি ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তার ধারে একটি কাঁঠাল গাছ নিজের বেড়ার মধ্যে ঘিরে নেয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে শাস্তি দেন। জজ সাহেবও হাইকোর্টের নির্দেশ মানতে অসম্মত হন। তাঁর ধারণা এ কাজটি একেবারে বে-আইনী। যেভাবে কাঁটার বেড়া দেওয়া হয়েছে, তাতে গাছটি আবদ্ধ রাখা হয়েছে, ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের লোকেরা গাছের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা—ফলও পেত না। হাইকোর্ট এ জটিল সমস্যার কিছু সমাধান করেছিলেন বটে কিন্তু বেঞ্চের একাধিক জজ এ কাজটি অপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টায় ছিলেন। আমি গাছটির বেইজ্ঞত ছাড়া আর কোনও অপরাধ প্রমাণ করতে না পারায় প্রায় তৎক্ষণাত্ ঐ কাঁটা বেড়ার আলিঙ্গন থেকে মুক্তির আদেশ হচ্ছিল। এই অভাগা দেশে যুবকটি আমার তার ভায়ের পক্ষ নিয়ে আপীল করার জন্য অতুরোধ করতে এসেছিল। আমি যদি ছুটি শেষ হবার আগেই ফিরে যেতাম তাও সময় মতো পৌছনো অসম্ভব হত। যাই হোক মামলা মূলতুবী রাখার আবেদন সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। অনেকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন ভাল্লুক বা ভাল্লুক শিকারে কাঁঠাল গাছ ও তার ছায়া চুরি বা বেড়ায় ঘেরার ইত্যাদির যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধ কোথায়? আমার মনে হয় শিকারী ও খেলোয়াড় মাত্রই অতি সহজে সেটা বুঝতে পারবেন তবে সাধারণ অর্থোক্তিক ব্যক্তির পক্ষে ওটা নাও হতে পারে। প্রথমত ভাল্লুক এ গাছের ফলটি খেতে খুবই ভালবাসে। তাছাড়া তাদের ও মফস্বলের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সাদৃশ্য দেখতে পাই বিশেষতঃ কঠোর ব্যবহারে। নিরপরাধীদের প্রতি এই ব্যবহার গত দশ বছর চলে এসেছে এবং সেজন্যে এদের বাড়ি বেড়েই চলেছে। শেষকালে মনে হয় উভয়ের বিষয়ই সমান হাঙ্গর। ভাল্লুক হয়তো সময়ে নিঃশেষ হতে পারে কিন্তু জঙ্গলের কর্মচারীর ভাষায় শেষোক্ত জীব ‘পবিত্র আশ্রয়ে’ আছেন বলে কিছুই করার জো নেই। ভাল্লুকের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব কিন্তু এঁদের যা মতবাদ তা এড়ানো একেবারেই অসম্ভব। একমাত্র দাঁত বার করে হেসে সব সহ করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

ভাল্লুকের স্বভাবের বিশেষত্ব যা আগে বা পরেও লক্ষ্য করিনি সে বিষয় এখন বলছি। আমার এক বন্ধু ভাল্লুকটি আহত করে তার পিছনের পা ছুটি একেজো করে দেন। ভাল্লুকটি চিৎকার করতে করতে নিজেকে টেনে টেনে চলছিল—আমরা এসে দেখি সে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে রাগ করে নিজের শরীরের অনেকখানি মাংস কামড়ে ছিঁড়ে

ফেলল। তার বুকের সাদা দাগের ভিতর গুলি করায় সে মরে গড়িয়ে পড়ল। আমরা পরে দেখলাম সে রক্তস্রোত বন্ধ করার জন্য আহত স্থানে পাতা পুরেছে—তাই যেতে যেতে থেমে গাছগাছড়া ছিঁড়েছিল।

ভাল্লুক শিকারে তাদের জন্য বসে অপেক্ষা করায় কোনো লাভ নেই। আহারের খোজে তাদের আসা যাওয়া এত অনিশ্চিত যে হঠাৎ বন্দুক চালাবার সুযোগ পাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকার শ্রান্তি ও বিরক্তি আসে। যখন মহুয়া গাছে ফুলফল ভরে ওঠে তখন এই ভাল্লুকের দেশে তাদের আস্তানা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও সে কৌতুকজনক দেখতে বটে তাও অতি বীভৎস ও ভয়ানক—তার গতি রোধ করতে হলে স্থির লক্ষ্য ও ৪৮০ গ্রেণ ভারী গুলির দরকার হয়। তার নখ ও দাঁত দুই-ই ভীষণ খরধার এবং কারণে অকারণে শরীরের প্রবল শক্তি প্রয়োগে এ দুই-ই অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকে।

১০ই জানুয়ারী ১৯১৮

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

গৌর বা ইণ্ডিয়ান ‘বাইসন’কে এই নামে অভিহিত করা ঠিক হবে কিনা জানি না, কিন্তু তাকে গৌরবের পদ দেওয়া উচিত। এই চমৎকার বৃষ জীবটি মৃগয়ায় শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত স্থানের অধিকারী—শিকারী বহু কষ্টে ও অরণ্যবিষয় জ্ঞানলাভ করে এই ঋষভশ্রেষ্ঠের দেখা পায়। শিকারে জয়লাভ তাদের একাধারে স্বপ্ন ও দুরাশা। কোনও কোনও জায়গায় তাদের নিঃশেষে ধ্বংস করা হয়েছে বা গভীর জঙ্গলে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাই এখন শিকারীকে অশেষ ধৈর্য ও অপরিমীম কঠোর চেষ্টায় আকাজ্জিত গৌর শিকার করতে হয়। তাকে পেতে হলে তার নিজের বাছা জায়গায় তাকে খুঁজতে হয় ও নানা জায়গায় লুকোচুরি খেলা বিরক্তিকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে সময় এদের সন্ধানে যেতে হয় সে ঋতুতে ম্যালেরিয়া ও জঙ্গলে জরের হাত এড়ানো যায় না।

পূর্ণবয়স্ক বৃষ যখন সদস্ত গভীরভাবে আসে ও ছলকি চালে দৌড়ে চলে যায় সে দৃশ্য ভুলবার নয়। তার দেহ ভারী ও অপেক্ষাকৃত খর্ব পাগুলি হাঁটুর নীচে থেকে ধবধবে সাদা, তার বড় নীল চোখ, বিশাল উন্নত শরীর ও প্রকাণ্ড মাথা গভীর নির্জন অরণ্যের জীবেরই উপযুক্ত। এদের মাথা ও শিং মোষের মতো অত বড় নয়

ও গরুর মতো এদের গলকষল নেই। ললাট ও ক্র গাঢ় পাংগুটে লোমে ঢাকা এবং কপালের উপর স্বদূর শিং দুটি তাকে আরও মর্যাদা দেয়। কত সময় পাহাড়ের উপর বা নীচে উপত্যকায় সতর্ক ও সাবধানে একে অনুসরণ করেছি। এ সব জায়গায় সব সময় বাতাস তোমার অল্পকূল হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া যখন কোনো শব্দের আভাস পেয়ে সমস্ত দলটি দ্রুতগতিতে উপত্যকার গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয় তখন মন প্রচণ্ড নিরাশায় ভরে ওঠে। দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য ধরে অন্বেষণ করে যখন হঠাৎ এই একক নিঃসঙ্গ কালো বুয়টি দেখা দিয়েও তড়িৎ-পদে বনে ঢুকে পড়ে—শুধু তার কৃষ্ণ দেহ ও সাদা মোজা পরা পা দেখতে পাই—বন্দুক চালাবার সুযোগও দেয় না, তখন মন আরও নিরাশ হয়ে পড়ে। সব বেশ ভালোভাবে কাটিছিল ক’দিন শুধু চারদিক বাতাসহীন থমথমে ভাব। সকালে মেঘের ঘনঘটা ছড়িয়ে গেল, চারদিকের পাহাড়ে : “আলো কে যে লোপ করে খায় সেই কুয়াশা সর্বনাশা”—একেবারে কালোয় ঘিরে ফেলল। তীব্র বজ্র ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আর মুঘলধারে বুষ্টি নামল যেন তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবারই ব্যবস্থা করেছে। শিকারের আশা তো গেলই, তাঁবুতে ফেরাও যেন অসম্ভব করে তুলেছিল। এই ক’দিনের নিরাশা ও অনেক পরিশ্রম করার পর যখন শিকারে ইচ্ছার অনুরূপ সফলতা লাভ হয় তখন মন আনন্দে ভরে ওঠে। গৃহের সজ্জা সুন্দর হয় ও গর্ব করার মতো শিকারের জয়চিহ্নও থাকে। কত দিনের আকাজক্ষা পূর্ণ হয়েছে, শ্রান্তি ও নিরাশার দিনগুলি ধুয়ে মুছে গেছে। জরের প্রকোপেও অতীতের মুগয়ার দিনগুলির স্থখ-স্থিতিতে ফিরে যাওয়া সব আনন্দময় হয়ে ওঠে।

হাতী ছাড়া অল্প জানোয়ারের সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব নেই। তাই এদের ধরার জন্য হাতীর দলের সাহায্য দরকার হয়। এরা হাতীর হঠাৎ আবির্ভাব ও আসা যাওয়ায় কোনো রকম সন্দেহ করে না—অবশ্য তাদের প্রতি যদি বারবার কোনো রকম উৎপাত না করা হয়। যেখানে এদের অনেকের বাস সেখানে অনেক সময় অবিবেচক শিকারী অনর্থক তাদের হত্যা করেন। এই হত্যা বন্ধ করার বিশেষ উপায় নেই বলে ক্রমশঃ এদের সংখ্যা কমে আসছে। তবে গৌর নিম্নলি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা কম কারণ গভীর ও দুর্গম অরণ্যের মধ্যেই এদের বাসস্থান।

যখন আমি এ বিষয় আরও জানব তখন তোমাদের সে কথা বলব। বিশেষত ঐ একক ঋষভশ্রেষ্ঠের কথাই বলছি। এই জাতির এরাই শ্রেষ্ঠ জীব, এদের অনুসরণ করতে আমরা অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এদের বিষয় যারা অভিজ্ঞ

বেশী, তাঁরা বলেন এদের সহশক্তি ও জীবনীশক্তি অসীম—তাই '৪৬৫ রাইফল ছাড়া অন্য ছোট কোনো বন্দুকের গুলি মারলে তাদের শরীরে সামান্য ক্ষত হয় ও বহুদিন ভুগে তবে মরে। একটা বাইসনের শরীর থেকে কতগুলো গুলি বের করা হয় তোমরা দেখেছ। কতদিন আগে যে এসব গুলি মারা হয়েছিল বলা শক্ত তবে মনে হয় বহু পুরাতন কারণ এর ওপর মাংস ও চর্বি জমে বেশ একটি আবের মতো দেখাচ্ছিল। গুলিগুলো দেড় ইঞ্চি চামড়ার ভিতর ছিল। দেখে মনে হয় ছুঁচ ফোঁটালে যতটুকু লাগে তার বেশী ওর লাগেনি। Holland and Holland যে '৫৭' করডাইট রাইফল আমার জন্তু সম্প্রতি তৈরী করেছে, ভরসা করি এই শিকারে আমার খুবই সহায়তা করবে। অন্তত বন্দুকটি দেখে তো সে আশা হয়। আমার 12 Bore Royal Nitro Paradox এই বুঘশ্রেষ্ঠের বিপক্ষে যা ক্ষমতা দেখিয়েছে তাতে 'হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ডের' কর্তারা খুব অবাক। বাইসনটি মাত্র দশ পা দূরে ছিল—তখন আমার পক্ষে গুলি চালানো ছাড়া কোনো গতি ছিল না। এ বন্দুকটি এ কাজের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়—এত বড় ক্ষমতালী জানোয়ারের উপর চালানোর জন্তু তো নয়ই। শুধু আমার ভাগ্য খুবই ভালো। অভিজ্ঞরা বলেন এ বন্দুকের গুলিতে এত বড় জন্তু মারা যায় না। কিন্তু সৌভাগ্য আমার যে ঘাড়ে গুলি লাগায় সে তখনই মরে পড়ে যায়।

১২ই জানুয়ারী ১৯১৮

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

অনেকগুলি সম্বরের মাথা বাড়ির দেওয়ালে লাগানো সুন্দর দেখাচ্ছে। এ হরিণ তোমাদের পরিচিত তবু আমার ইচ্ছা যে তোমাদের ওর বাইরের অরণ্যের বাসভূমি দেখাই। এর উন্নত সুন্দর দেহ, ডাগর আঁখি দুটি, শক্তিময় স্থায়ী গতি, শাখাবিশিষ্ট শৃঙ্গ, সব মিলে তাকে সুন্দর ও মহৎ বলা চলে। সারারাত বনে ঘুরে সকালে সে যখন কোনো পাহাড়ের দিকে বিশ্রামের জন্তু আসে তখন দেখতে ভারী চমৎকার লাগে। চকিত ভীত দৃষ্টিভাব সব জন্তুকে শ্রী দান করে কিন্তু এ হরিণের মতো কোনোটা নয়। বিপদের আশঙ্কায় সে যখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে তখন বড় মনোহর দেখায়। এদের বাসস্থান বিস্তৃত। দু-একটা সুন্দর শিং ও মাথা গৃহশোভার জন্তু কষ্ট করে লাভ করায় মার্বকতা আছে।

প্রকৃত শিকারী কখনো অথবা প্রচুর হরিণ হত্যা করে না। আমি এই সুন্দর ও মহিমান্বিত জীব হত্যার পক্ষপাতী নই। লবণ-স্বাদের জন্য ও জলাশয়ের কাছে তাদের হত্যা করা যুগযাবিরুদ্ধ আচরণ। শীতকালেও এরা জল-কাদায় গড়াগড়ি দিতে ভালোবাসে ও যে সব পাহাড়ে সাধুর হরিণ থাকে তার কাছাকাছি গ্রামের কিছু বাইরে জলাশয়ে তাদের এই অভ্যাসের চিহ্ন সর্বদা দেখা যায়। একবার বাঘের আশায় এমনি একটি জলাশয়ের কাছে আমি অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় অতি সাবধানে একটি বড় জানোয়ার আসছে বুঝলাম, কিন্তু বাঘ যে নয় সে তার পদক্ষেপের শব্দে মনে হয়েছিল, তারপরই ঝপাং করে জলে পড়ার শব্দ পেলুম। দেখি একটি সাধুর সশব্দে কাদামাটিতে স্নান করছে—এ পাশ থেকে ও পাশে গড়াগড়ি দিচ্ছে—নালায় পাথরে তার শিং লেগে খড়মড় করে উঠল তাও স্পষ্ট শুনলাম। গারো পাহাড়ের ঘাসের জঙ্গলে প্রচুর আছে—গ্রীষ্মের সময় খুব ঘুরে বেড়ায়। তবে মধ্যভারতে তাদের জাতভাইদের শিং ও মাথা ঢের বড় হয়। এ রকম হয় কেন বলা কঠিন। তাছাড়া গাঢ় বাদামী রঙের প্রকাণ্ড উন্নত দেহের সাধুরের শিংগুলি তাদের চেয়ে আয়তনের তুলনায় ছোট; কিন্তু হালকা বাদামী রঙের সাধুর হরিণের শিংগুলি বৃহৎ। এ প্রভেদ কি কারণে আমি জানি না। অনেকে আমায় বলেছে যে মধ্যপূর্ব অঞ্চলে এক বিশেষ জাতের সাধুর আছে তার নাম গো-সাধুর। শীতকালেই এদের দেখা যায়। এদের বিশেষত্ব করতলাকৃতি শিং। একজন ফরেস্ট অফিসারের কাছে শুনেছি তিনি এ প্রদেশে সাধুর দেখেছেন। আমার জানা নেই কোনো শিকারী এ জাতের সাধুর দেখেছেন কিনা কিংবা হয়ত এটি প্রকৃতির খামখেয়ালী সৃষ্টি। এর নমুনা যোগাড়ের চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যপূর্বের বিভিন্ন জায়গায় অনেকেই এই সাধুরের বিশেষত্ব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন—তাই এদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে হয়েছে।

সাধুরের জীবনীশক্তির তুলনা হয় না। একমাত্র বাইসন ছাড়া অণু কোনো জানোয়ার আহত হয়ে এদের মতো অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে না। ঘাড়ে ও কাঁধে গুলি লেগেও একটি হরিণ প্রায় দু'শ গজের উপর দৌড়েছিল যে আমার বন্ধু মনে করলেন তাঁর গুলি ফসকে গেছে। তিনি ১২ নম্বর প্যারাডক্স দিয়ে প্রায় ত্রিশ গজ দূর থেকে গুলি করেন। তাঁর প্রথম গুলিটির শব্দে মনে হল পাথরে লেগেছে—দ্বিতীয়টি ঠিক লাগে। আমার অহুমান ঠিক ছিল—প্রথমটি ওর শিং ছুঁতে লাগে—দ্বিতীয়টি কাঁধে লাগে। বাঘ ও চিতা যখন তাদের তাড়া করে তখন ঐ ঘন জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে দিয়ে পালারার চেষ্টা বৃথা হয়—শিং ছুঁ

বাঁচিয়ে মাথা নিচু করে পালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। গত আশ্বিন মাসে বন পিটিয়ে হাঁকাইরা যখন আসছিল—ভয়ে তাদের মধ্য দিয়ে পালাতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। ভয়ে বেচারার জ্ঞান ছিল না—সোজা লাফিয়ে যেতে গিয়ে একটি গাছের গুঁড়ির কাছে যেখানে দু'ধারে দুটি ডাল গিয়েছে সেখানে তার শরীর আটকে গেল—আর গাছে জড়ানো ঘন লতায় তার শিং দুটি এমন জড়িয়ে গেল যে সে কিছুতেই ছাড়াতে পারল না। তাকে এই শোচনীয় অবস্থায় বড়ই অসহায় দেখাচ্ছিল। তাকে উদ্ধার করাও অসম্ভব। তাছাড়া একজন হাঁকাই নির্মমভাবে কুঠারের আঘাতে তার পা ভেঙে দিয়েছিল। আমার পৌছবার আগেই এটা ঘটে তাই বলা বাহুল্য তার যন্ত্রণার শেষ করে দেওয়া হল।

আমার মতে এর পর বারশিঙ্গার সৌন্দর্য দ্বিতীয় আসন পাওয়া উচিত। সাধুরের চেয়ে আয়তনে ছোট হলেও তার হালকা বাদামী রঙ সোনার মতো ঝকঝক করে আর তার উপর কয়েকটা কালো ডোরা ও দু-চারটে সাদা বুটিতে আরও সুন্দর দেখায়। এরা জলাজমিতে থাকে ও জল ভালোবাসে। সর্বদা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। অনেক সময় এদের দুটি শিং-এ চৌদ্দটি শাখা দেখা গেছে। এ রকম একটি মাথা পাওয়া শিকারীর পক্ষে খুবই আনন্দদায়ক।

চিতল হরিণের সুন্দর পোশাক দেখে বোঝা যায় সে ঝোপঝাড়ের বাস করে। যে বনের কাছে নদীনালা থাকে তার কাছেই থাকে, আবার বনের মধ্যে যে সব খোলা জায়গা আছে সেখানেও থাকতে দেখা গেছে। যখন দলে দলে অরণ্যের ছোটখাটো পথ দিয়ে এদিকওদিক যায় কিংবা বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে দেখা যায় তখন ওদের ঐ গুলদার পোশাকী শরীর আরও সুন্দর দেখায়। আবার যখন বনের খোলা জায়গার ঘাসের উপর দ্রুত গতিতে দৌড়ায় তখন হাতীতে বসে ওদের শিকার করায় আমোদ পাওয়া যায়। ভীতির সংকেত ডাক দিতে এরা খুব পটু। একবার এদের এই সঙ্কেতে দুটি আহত ভাল্লুকের সন্ধান করতে পেরেছিলাম। একটি বাঘ যখন আমাদের এড়িয়ে চুপচাপ পাহাড়ের দুর্গম ও বন্ধুর পথে অদৃশ্য হচ্ছিল তখন তাকেও খুঁজে বার করতে সহায়তা করে।

মণ্টজ্যাক বা Barking Deer (হিন্দী নাম, ঘুট্টরী) খুব ছিমছাম ও মনোহারী—এরা ভীক ও একলা থাকতেই ভালোবাসে। এদের শরীরের উপর দিকটা উজ্জ্বল তামাটে বাদামী ও দাড়ির কাছে একটু সাদা ও এদিক ওদিক শরীরে যেন সাদা ছোপ লাগা—তার চেহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষত যখন এদিক-ওদিক খুঁটখুঁটিয়ে পালায় ও অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দেয়। তার সুন্দর শিং

ছুটিতে খাসা কলমদান করা যায়। একবার বরাত জোরে আমি ধশলাও করলাম। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা হরিণ পাহাড় থেকে দৌড়ে নীচে নামছিল। আমার গুলি চালাবার ইচ্ছে ছিল না। সঙ্গে যে শিকারী ছিল সে আমায় গুলি মারতে আগে কখনও দেখেনি—হাতের টিপ তাই পরখ করতে হরিণ দেখিয়ে ডাক দিল। বড় জানোয়ার মারতে নিয়ে যাবার আগে পরীক্ষা করছিল। তখন হরিণটি আরো পনের গজ দূরে চলে গেছে। আমার ৪৫০ করডাইটের গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে ছোট খরগোসের মতো টপ করে পড়ে গেল—পরে দেখলাম গলাটা তার গুলি লেগে যেন ক্ষুর দিয়ে কাটার মতো কেটে গেছে।

পারা বা Hog Deer খোলা ঘাস জঙ্গলে পাওয়া যায়—শুয়োরের মতো মাথা নীচু করে চলার জন্য বোধহয় ওর এই নাম। জঙ্গল ও শরবনের মধ্যে যে সব সরু পথে অনবরত জন্তুজানোয়ার যাতায়াত করে তার ভিতর দিয়ে যেতে হলে, মাথা নীচু করা ছাড়া উপায় নেই। বনে আগুন লাগা জায়গায় এরা চরতে ভালোবাসে ও ছোট ছোট ঘাস খায়। অনেক সময় হাতীর ঠুঁড়ির কাছ থেকে চমকে পালায়, তখন শিকার পেতে হলে খুব সোজা ভাবে গুলি চালাতে পারলে তবেই মারা যায়।

Mouse Deer খুব ছোট ও কোমল। হাঁকায় এরা হঠাৎ বেরিয়ে আসে ও চুনং ছুরুর গুলিতেই মারা পড়ে। মধ্যভারতের বনে এদের প্রচুর পাওয়া যায়। এরা লম্বায় মাত্র এক ফুট—এদের মেরে কোনো লাভ নেই।

চিংকারা বা Gazelle পাহাড়ের নালা ও গিরিখাদের কাছে থাকে। এদের বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে অনেক আছে। এদের শিকারের জন্য ছোট রাইফেলই যথেষ্ট। রেঙ্গিতে (এক রকম ছোট গরুগাড়ি) এগিয়ে গিয়ে শিকার করা খুব সুবিধের। রেঙ্গি ছোট তিনকোণা গাড়ি, বলদেই টানে। এতে খড় বিছিয়ে তার উপর কন্ডল দিয়ে বসতে হয় চালকের সঙ্গে পিঠে পিঠি হয়ে। রেঙ্গি গাছে চড়া ছাড়া সব জায়গায় যায়—এমন কি জলেও সাঁতার দিতে পারে।

চৌশিঙ্গার চারটে শিং আছে তাই এর এ নাম। সামনের শিং দুটি পিছনের দুটির চেয়ে ছোট। মধ্যপ্রদেশে অনেক আছে, পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে ও বোপজঙ্গলে এরা থাকে। এরা খুব লাজুক ও সচরাচর যেখানে বেরোবার কোনো আশা নেই, সেখানেই শিকারীর সামনে আসে। হয়তো তখন অল্প বড় ও ভালো কোনো

শিকারের জন্য গুলি স্তগিত রাখতে হয়।

নীল গাইকে আমাদের দেশে গাই কেন বলে জানি না—এই হরিণটি বরং ঘোড়ার মতো দেখতে। এ হরিণের পুরুষদের গলার নীচে লম্বা চুল আছে, মনে হয় যেন ভুল করে ঘোড়ার কেশর নীচে লাগিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধি এদের খুব কম, বোকাই বলা চলে—তাই কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে ফিরে দেখবে। শরীর এত বড়, যদি খুব বেশী দূরে না থাকে লক্ষ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা কম। এদের পুরুষদের রঙ ইস্পাতের মতো। এদের চামড়া দিয়ে খুব ভালো ব্যাগ তৈরী হয়। জঙ্গলে আজও এদের সংখ্যা অনেক—যে সব রক্ষিত জঙ্গলে শিকার মানা সেখানেও এদের শিকার মানা নেই।

আমাদের দেশের হরিণের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন কৃষ্ণসার। শুনেছি ‘বেরাবে’ অনেক আছে। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে দলের পর দল কৃষ্ণসার দেখেছি। গত খুস্টমাসের ছুটিতে, একটা দূর বনের অভূত জায়গায় যাই—সেখানে এই হরিণের দল আমাদের রেস্কির প্রায় একশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল। তারপর ধীরেস্থলে চলে গেল, আমরা পাশ দিয়ে খড়খড়িয়ে চললাম। আমি যে মাটির কুটিরের অশ্রয় নিয়েছিলাম তার বারান্দা থেকে প্রতিদিন সকালে দেখতাম, চাষার তাড়ায় এই সুন্দর হরিণের দল পালাচ্ছে। এখানে কাছেই দু-তিনটি দল ছিল—ঐ দেশের ভাষায় এদের ‘গোল’ বলত, তবে এদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাব দেখিনি।

ভ্রাতৃত্বাবের কথা তুলে একটা বিশ বছরের বেশী পুরোনো গল্প মনে এল। সেই সময় একজন M.P. (ইংলণ্ডের) এখানে ভ্রমণ করতে আসেন। শিবপুর ‘বোটানিক্যাল গার্ডেনস্’-এ তিনি নিমন্ত্রিত হন। অনেকের মতো তিনিও এদেশে ভ্রমণের সময়ের যতদূর সম্ভাব্যব্যহার করা যায় সে চেষ্টায় ছিলেন। এ লোকটি ধাতু গলাবার পাত্র আবিষ্কার করে অনেক টাকা করেছিলেন। আমাদের দেশী বন্ধুরা ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তখনকার রাজনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় খুবই উৎসাহে তাঁকে শোনাচ্ছিলেন। তিনি কথা কম বলেন হয়তো, বুঝছিলেন আরও কম। আর এই সব স্বদেশভক্তের দলের মধ্যে ঠাসা হয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন ‘Home Charges’, ‘Separation of the Judiciary from the Executive’, ‘More members of Council’ ইত্যাদি দু-চারটে কথা আমার কানে এসে পৌঁছেছিল। ‘HomeRule’-এর বিষয় কথাটা তখনও ওঠেনি। যে লোক কানে কম শোনে তার মতো কখনও তিনি ‘হ্যাঁ, তাই তো বা, তাই বুঝি’ বলছিলেন। শ্রীমতী ও কুমারী M.P.-র প্রশ্নোত্তর দিয়ে আমার সময় বেশ

কাটছিল। ভারতে থাকায় সাপের ভয়, বাঘের ভয়, জরজারির প্রকোপ, আরও হাজার হাজার অশুভের ভয়, বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম যে এজন্য যত শীঘ্র পারেন দেশে ফেরাই ভালো এবং এ দু-দেশের মধ্যে যে সাত সমুদ্র তেরো নদী বইছে তার ওপারেই তাঁদের বাকি জীবনটা কাটানো ভালো। আমি কোনো একজনের জুতোর ভিতর সাপ আবিষ্কার করার ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করতে করতে একটি দীঘির কাছে পৌঁছলাম। এটিতে অনেক রাজহাঁস ছিল—একদল কালো ও একদল সাদা—ওরা নিজেদের শরীরের পালক পরিষ্কার করতে ব্যস্ত ছিল। আমি M.P. ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এ দু’ দলের সৌন্দর্যের কিছু তফাত দেখছেন কি?’

তিনি বললেন, ‘তা তো দেখছি না, উভয়ই অতি সুন্দর।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু দেখছেন ওরা সম্পূর্ণ আলাদা থাকছে, কেউ কারুর সঙ্গে মেলামেশা করছে না।’

তিনি—‘তা তো দেখছি, এ অতি কৌতুকদায়ক।’

আমি বলি, ‘ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যা এতেই পাবেন।’
এতক্ষণ তিনি যে সব কথা দীর্ঘ অসংলগ্নভাবে শুনে বুঝতে পারছিলেন না এখন তা সুস্পষ্ট ও সরলভাবে বোধগম্য হল। আমার বন্ধুরা তাঁর এই রাজনৈতিক শিক্ষা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল দেখে, বাংলা ভাষায় নির্দয়ভাবে আমায় বেশ ‘হু’ কথা শুনিয়ে দিলেন। শ্রীমতী M.P. আমার এই মেলামেশা ও ভ্রাতৃত্বাবের কি কথা হচ্ছে জিজ্ঞেস করায় নিরীহ ও নির্দোষীর মতো সরলভাবে জানালাম এতে বিচিত্র বর্ণসঙ্কর হয়। প্রকৃতিতে আমরা দুটি রঙের প্রাধান্য দেখি, যথা : সাদা ও কালো। পুরুষ পশুপাখীর বর্ণ উজ্জল ও বিশেষভাবে দর্শনধারী। বোধ হয় প্রকৃতি চায় না এরা সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করে ; কিন্তু এদের স্ত্রীজাতী পারিপার্শ্বিক গাছপালা জমি ইত্যাদির সঙ্গে মিশে থাকে—তাই বেশী চোখে পড়ে না ও পুরুষজাতির মতো সহজে শত্রুর কবলে পড়ে না। বৃদ্ধা হরিণী সাধারণত পাহারা দেয়—হরিণগুলি তখন হয়তো খেলা নয় তো লড়াই করতে ব্যস্ত। আমার একটা হরিণের মাথা আছে যার একটা শিং মাঝখান থেকে ভাঙা। এটি তার লড়াইয়ের বিজয়ের লক্ষণ, যদিও অক্ষত নয়। এই ভীকু লাজুক জানোয়ারের কাছে যেতে হলে কি উপায় অবলম্বন করা দরকার তা সকলেই জানেন। তাই আমার আর বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই। একবার একটা হরিণকে গুলি করার পর দলকে দল লাফিয়ে লাফিয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হল কিন্তু সে দলে আমার মতো আর হরিণ ছিল না।

তাই আমি উঠে দাঁড়াতেই তারা পাঁচ-ছ' গজের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে আমার ডান দিক বাঁ দিক দিয়ে চলে গেল—এ দৃশ্যটি ভারী সুন্দর। আমার রাইফেলের শব্দে চমকে বড় বড় হরিণীর দল সোজাভাবে খুব উঁচু উঁচু লাফাল—উঁচু মাটির ওদিকে দেখার উদ্দেশ্য—কারণ আমি ঐ উঁচু আলের আড়ালের স্রবিধে নিয়ে অত কাছে যেতে পেরেছিলাম।

আমার শেষ কথা বলে তোমাদের সাবধান করছি—সর্বদা মনে রেখো খোলা মাঠে গুলি চালানো বিপজ্জনক। সকল সময় চারিদিক দেখে—এমন কি দূরবীণ দিয়েও গুলি চালাবার পথটি দেখে নেবে। দেশের নানা জায়গায় এ কর্তব্যের অসাবধানতায় অনেক বিপদ ঘটেছে। আমার মতে এ বিপদ ঘটতে দেওয়ার চেয়ে শিকারের সব সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ভালো। এর অবহেলা করা উচিত নয়—অনেক সময় এজন্য সারাজীবন অল্পশোচনা করতে হতে পারে।

১৫ই জানুয়ারী ১৯১৮

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ,

বন জঙ্গলের বিষয় শেখানো যায় না যদি না সে রকম অরণ্যবিভাগ অভিজ্ঞতা যার আছে তাঁর কাছে অবিরাম দক্ষতার সঙ্গে শিখতে পারো। মানুষকে উড়তে শেখানোর মতো এ বিদ্যা কঠিন। তাই শৌখিন ভাবে এ শেখা যায় না। প্রথমত যে জন্তু শিকার করতে যাবে তার স্বভাব, গতিবিধি সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাছাড়া বনের বিভিন্ন পশুপাখীর বিষয়ও অনেক জানা প্রয়োজন। শুধু যে বাঘ, চিতাই নিশাচর তা নয়—তারা যে সব জন্তু শিকার করে তারাও নিশাচর। ভাল্লুক ও বাইসানেরও এই প্রকৃতি। বেশীর ভাগ লোকের এ বিষয় জানার উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ অনুরাগ নেই। এই সব হিংস্র প্রকাণ্ড জন্তু শিকার করতে হলে তাদের বিষয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার। পায়ে হেঁটে নিরাপদে শিকার করতে চাইলে এ সব নিত্যন্ত প্রয়োজন। অপরে যা করেন তা হল এই—জন্তুর খোঁজ করা, শিকারে কে কোথায় বসবে সে বিষয় বচসা, নির্বিচারে আহত জন্তু অনুসরণ করা—এ সব বেশীর ভাগ সময় বিপদ ঘটে। তাই তাঁরা হাতীর পিঠে চড়ে বা মাচায় বসে শিকার ভিন্ন পায়ে হেঁটে শিকার নিত্যন্ত নির্বোধের কাজ বলে মনে করেন।

সর্বদা একজন গাইডের সঙ্গে বনজঙ্গলে ঘোরা ও তার কাছ থেকে বহু জন্তুর

রীতিনীতির বিষয় শেখা উচিত। তাছাড়া আমার পরামর্শ বনে জঙ্গলে
 বন্দুক না নিয়ে কখনই যাওয়া উচিত নয়। যখন এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য
 ঘুরে বেড়াবে তখন গুলি চালাবার প্রলোভন সংবরণ করো। সমতল জায়গার
 ঘন ঝোপঝাড়, বাঁশবন, ঘন বেতবনের ভিতর চলা খুবই মুশকিল কারণ প্রায়
 নাকের ডগার আগে কি আছে না আছে কিছুই দেখা যায় না। যথেষ্ট জ্ঞান-
 লাভ হওয়া সত্ত্বেও বনের সংকীর্ণ পথগুলিতে চলতে খুব সাবধান হওয়া দরকার—
 যদিও হয়তো জানো জন্তুটি কোথায় আছে। আমার পুরনো গাইডরা এসব
 জায়গায় যেতে হলে গলা খাঁকড়াতে খাঁকড়াতে এগোবার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে
 দাঁড়াত—এতেই জন্তু হয় চলে যেত নয় চুপ করে পড়ে থাকত। ভাল্লুক, হরিণ,
 শুয়োর, নকুল—এ সব জানোয়ার চললেই বোঝা যেত। রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে
 পাখীদের বাসায় আসার কিচিরমিচির থেমে যায়, তখন বাঘ চিতা, হরিণের ভ্রমণ
 আরম্ভ হয়, সন্ধ্যার আগেই এদের ঘুম ভেঙে যায় ও তারা বনে ঘুরবার জন্য ব্যস্ত
 হয়ে ওঠে। এই সময় কিংবা ভোরের আলোর আগে যখন হরিণ, শুয়োর নিজেদের
 আশ্রয়ে ফিরে চলে, বাঘ ও চিতা তাদের শিকার করার সুযোগ নেয়। ঘন
 ঝোপের মধ্যে জন্তুদের চলাফেরার জন্য সর্বদা সরু পথ সৃষ্টি হতে থাকে। যে সব
 পথে বাধা অল্প সে পথেই পশুরা যায়-আসে। আবার পাহাড়ের জঙ্গলে জন্তুরা নীচে
 যাবার পথ করে নেয়। এই পথেই ছোটখাটো নদীনালা বয়ে চলে—ক্রমে এই সব
 সংকীর্ণ পথ তাদের রাজপথ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে হয়তো খাড়া পাহাড় অন্যদিকে
 গভীর জলাশয় কিংবা হয়তো খাড়া বড় বড় পাথর পথ আটকে সোজা হয়ে
 আছে। সে রকম জায়গায় বাধা এড়িয়ে পথ কমানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। সব
 জানোয়ারই কেমন করে পাশ কাটিয়ে যেতে হয় তা জানে। সতর্ক দৃষ্টি শিকারীও
 তা বুঝতে পারে। অন্ধকারে বাঘ চিতা খোলা পথেও ঘোরে কিন্তু দিনের
 আলোয় ঝোপে ঝাড়ে গা ঢাকা দিয়ে যায়—নেহাত তাড়া খেয়ে বা বিপদে পড়লে
 খোলা জায়গা দিয়ে দৌড়ে পালায়। রাত্রে ঘোরার সময় তারা গরুর গাড়ির পথ ও
 মানুষের পায়ে চলার পথ ধরে, কারণ জানে এ পথে জলা জমি, জলাশয় বা অন্য
 বাধা থাকবে না। আমি জানি একবার একটা বাঘ গরুর গাড়ির রাস্তা ছেড়ে
 বনের ভিতর প্রায় দুশো গজ দূরে চোখের আড়ালে একটি মোষ বাঁধা ছিল সোজা
 সেখানে পৌঁছল—তার ব্রাণশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল। তখনও তার পায়ের চাপে
 নালার বালি থেকে জল গড়াচ্ছিল ও অন্য পায়ের দাগগুলির ভাঙা-ভাঙা ধার তখনও
 ভিজে ছিল, আর গাছের গা ঘেঁষে যাওয়ায় শিশির ঝরে পড়েছিল। তারপর আর

গাছের পাতায় শিশির পড়েনি। এসব দেখে বোঝা গেল দিনের আলোয় সে হত্যা করেছে। এই সব বড় রাস্তার ধারে, জলাশয়ের কাছে কিংবা ঝোপে ঢোকার পথে বা বেতবনে বাঘের খাবার চিহ্ন দেখতে হয়। ওগুলো দেখে বুঝতে পারা যায় যে তারা বেড়াতে গেছে না গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। আবার এই সব খাবার চিহ্ন অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, অরণ্যবিহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকলেই বুঝতে পারবে কোথায় কোথায় দেখতে হবে। হয়তো দেখবে দু-একটা পাথর উঁটে পড়ে আছে বা গাছের পাতা ছুঁড়ে আছে কিংবা পল্কা গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে—এ সবই তার পায়ের চাপে হয়েছে। এগুলি কতদিনের পুরোন তাও অনুমান করা কঠিন। প্রতি ঘন্টায় বদলে যেতে পারে—এগুলোর উপর ধুলো উড়ে পড়ে অনেকটা মুছে যায় আর হয়তো তার উপর দিয়ে অল্প জানোয়ার চলার ফলেও সেগুলি অস্পষ্ট হয়। ভিজ়ে মাটির উপর আগের দিনের দাগগুলি দেখে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে মনে হয় ঘন্টাখানেকের বুঝি। হরিণ গরু মোষ ইত্যাদি জানোয়ারের চলাফেরায় শুকনো পাতা বা ছোট ছড়ির উপর ক্ষুরের দাগ, নরম খাবার দাগ থেকে একেবারে ভিন্ন। বাঘ ও চিতার ঘরে ফিরতে দেবী হয়ে গেলে যে খাবার চিহ্ন পড়ে আর যখন সে শিকারের সন্ধানে ঘোরে এ ছুঁধরনের খাবার দাগ একেবারে অল্প রকম। যখন তুমি এই সব পায়ের চিহ্ন প্রায় নিভুলভাবে বুঝতে পারবে তখন জানোয়ারটি কোথায় আছে, কোন্‌খানে লুকিয়েছে, তাড়া খেয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে বা কোন্‌ পথে গেছে এ সব বুঝতে তোমার পক্ষে শক্ত হবে না। কোথাও তুমি এমন গাছ বা পাথরের টিবির পিছনে আশ্রয় নিলে দৃষ্টির ব্যঘাত হবে না অথচ তোমায় কোনো জন্তু দেখতে পাবে না, লক্ষ্যও অব্যর্থ হবে—এ সবই সহজে বুঝতে পারবে। তুমি দাঁড়িয়েই থাক বা যে কোনো রকমে বসে থাক, তোমায় নিস্তরূ নিশ্চল হয়ে থাকা শিখতে হবে। সামান্য নড়লেই ধরা পড়ে যাবে—হয়তো কোনো জন্তু তোমায় আক্রমণ করবে তা নয়তো তোমার শিকারের সব সুযোগ ভঙুল হয়ে যাবে।

যে সব পাখী মাটিতে বাস করে তারা সহজে বাসা ছেড়ে যায় না, নেহাত কোনো জন্তু কাছাকাছি এলে অতি অল্প দূরে উড়ে বসে, তাদের একমাত্র অভিপ্রায় জন্তুটিকে বাসা থেকে দূরে রাখা। কয়েকবার এ রকম একটি পাখী আমায় চিতাবাঘের আগমন জানিয়েছিল—বন-পেটার লোকেরা অনেক দূরে ছিল, সেজন্য পাখীটির ব্যস্ত হয়ে ফুড়ুং ফুড়ুং করে বারবার দূরে উড়ে যাবার কারণ ছিল না। বাদরের দলও বাঘ দেখলে গাছে গাছে চোঁচামেচি কচমচানি করেই চলে।

এ রকম করে বাঘ তাড়িয়ে আনতে হাঁকাইদের সাহায্য করে। তোমায় জানিয়ে দেয় বাঘ আসছে। চিতল হরিণের শঙ্কিত ডাকও এ কথাই জানায়। অনেক সময় শুয়োরও অকারণ ঘোঁংঘোং ও স্পর্ধাপূর্ণ শব্দে বাঘের আবির্ভাবের আভাস দিয়ে দেয়। এই তো সেদিন ছোটো ভাল্লুক একই পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নেমে আসছিল। তারা ব্যাঘ্র পরিবারের পিছনে ছিল (বাঘ, বাঘিনী ও পূর্ববয়স্ক শাবক)—তাদের দেখেই সচরাচর চলার সাধারণ পথটি ছেড়ে খাড়াই পথ দিয়ে ভয়ে চিংকার করতে করতে হুড়মুড় করে নামল। তাদের এই ব্যবহার আমি নিভুলে বুঝেছিলাম—পরে তার প্রমাণ পেলাম।

শীতকালে পাহাড়ের জঙ্গলের চোরকাঁটা মহা বিরক্তিকর। এই কাঁটা বাঘ ও চিতার পুরু সুন্দর নরম চামড়ায় আটকে যায়—যেমন চামড়ার ‘গেটার’ না পরে শুধু মোজা পরলে এ দশা তোমারও হবে। হাঁকা করার সময় এই চোরকাঁটা ভরা জায়গা বাদ দিতে পারা যায়—কারণ জন্তুরাও এটা এড়িয়ে চলে। একটা বাঘ একবার একটা গরু মেরে চোরকাঁটা-ভরা জমির উপর দিয়ে নালা থেকে টেনে পাড়ের কাছে গাছের নীচে রেখেছিল—মদিও দূরত্ব অল্পই ছিল। দেখলাম গোল গোল করে ঘুরে পায়ের চাপে ঘাস মাটির উপর চেপে দিয়েছিল—বোঝা গেল বলদটি মুখে করেই ঘাস পরিষ্কার করেছে। তাছাড়া দু-এক গ্রাস খাবার আগে ঘাসটা চেপে সরিয়েছিল। এ রকমে স্বাভাবিক স্বভাবে কোন্ পথ ধরে ফিরে আসবে জানা কঠিন হয়নি।

শেয়াল যখন ফেউ ফে-উ-উ করে ডাকে তখন সে সব সময় বাঘ বা চিতার পিছন পিছন ডেকে চলে তা নয়—এটি ভয়ের ডাক। একবার দিনের আলোয় একটা শেয়াল পিছনের পায়ের উপর বসে আমাদের মোহনলাল হাতীকে দেখে ভয়ে এ রকম চিংকার করে গলা ফাটাচ্ছিল। মোহনলাল বেশ দূরে আপন মনে কলাগাছের খোড় চিবুতে ব্যস্ত ছিল। মাছত হাতীর পিঠ থেকে নেমে গিয়েছিল, আমিও প্রায় তিন শ’ গজ দূরে একটা ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। যদি দেখ বনের এই ধান্ডড় জাতি জন্তুগুলো ভোরে এদিক-ওদিক ঘুরছে ও মাঝে মাঝেই ফেউ ফেউ করে ডাকে, তখন যদি জঙ্গল পেটানো আরম্ভ কর, দেখবে কাজটি ভুল হয়নি। এ পরিশ্রমের পুরস্কারও নিশ্চয় পাবে। এ বিষয় আর বেশী বলার দরকার নেই। জন্তু অহুসন্ধানকে বিজ্ঞানত্ব বলতে পারো—অসীম ধৈর্য, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে তা আয়ত্ত করতে পারো। তোমার এ বিভ্রাটশিষ্কার জন্য মনোযোগ দিয়ে চারিদিক দেখা ও দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি বিশেষ দরকার। দুঃখের বিষয় যে সব

শিক্ষকের হাতে আধুনিক কালে শিক্ষার ভার আছে তাঁরা ছাত্রদের এ সব উৎসাহ দেন না—কোনো রকম শিক্ষারও সাহায্য করেন না। যে সব শিক্ষক মশা, ঝাইপ ও হাতীর মধ্যে এদের বৈশিষ্ট্য পৃথক করতে পারেন না তাঁরা অধ্যাপক পদলাভের অযোগ্য। Charles Lamb-এর মতে বলা চলে এ তিনটি জীব তাদের জীবনীশক্তি এই ঠোঁট, শুঁড় ও লম্বা নাকের সাহায্যে আহরণ করে, অধ্যাপকগণও তাঁদের খাণ্ডের বা পালকের কলমের সাহায্যে প্রচুর ভাবে তাই করেন।

১৬ই জানুয়ারী ১৯১৮

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ

তোমাদের এখন আমি দুটি শিকারের বিষয় বর্ণনা করব।—একটি পাহাড় অঞ্চলের এবং অন্যটি আমাদের দেশের বাড়ির কাছেই বাংলার সমতল ভূমির। এ কথা তোমাদের ভালো লাগবে মনে হয়। অতীতের দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক অভিযান ও ভবিষ্যতে আশা—এ দুটির কথা ভাবতে আনন্দ হয়। গিরিপথের দুর্গম স্থানে ও সমতল ভূমির সুন্দর দৃশ্যের স্মৃতিতে বারবার মন ফিরে চলে। যে সব ঘটনায় নিরাশ হতে হয়েছে, যে সকল কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে—এগুলি শুধু ঐ সময়টুকুর মতো বিরক্ত লেগেছে। ভাবতে গেলে এ সব দুর্ঘটনার দুঃখ, বিলাসিতা সুখের মতোই, লোকে যত বেশী মনে করে তত নয় বরং ক্ষণস্থায়ী। রুষ্টিতে ভিজে ভিজে তাঁবুতে ফিরে দেখলে, জিনিসপত্রের কোথায় গেছে তার ঠিক নেই। রাতের অন্ধকারে হাতীতে চড়ে জঙ্গলে নদীনালা জলাভূমির পথে ঘন্টার পর ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে শান্ত ক্লাস্ত হয়ে উঠলেও—এ সব অসুবিধার দুঃখ বেশীক্ষণ মনে রাখা যায় না, যদি তুমি সত্যি খোলা প্রান্তর ভালোবাস ও মৃগয়ায় অনুরক্ত হও। প্রথম দিনই ঘরে ফিরে যা আরাম ও আনন্দ লাভ হয়। তারপর শহরের ইট-কাঠ ও রাজপথ অল্প সময়েই মনে শ্রান্তি আনে। তখন আবার সেই সব খোলা মাঠ, বনের শ্যামলশ্রী, স্নিগ্ধ ছায়া, নির্মল বাতাস, নীল আকাশের জন্ত মন কেমন করে ওঠে। প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য দেখার ও অনুভব করার সুখ ও দুঃখ মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে পারলে পরম শান্তি ও চরম আনন্দ উপভোগ করা যায়—যা আমাদের এই আধুনিক জীবনে খুবই দুর্লভ। উপনিষদে ‘বন’ কথাটির প্রতিশব্দ ‘আনন্দ’।

শহরের আমোদে, কাজের ভিড়ে মানুষ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এই কলুষিত শহরে আকাশের চাঁদ ও গ্রহ-নক্ষত্র আমাদের বন্ধু তা জানতে দেয় না। তোমার চোখের দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে, তাদের লুকিয়ে রাখে। কালপুরুষ (নক্ষত্রপুঞ্জ) আকাশের কোন্ দিকে আছে দেখে বোঝা যায় রাত্রি কত প্রহর হল। চাঁদের ষোলকলা, তার উদয় ও অস্ত, তার আকার বদলানো—সবই তোমার দৃষ্টিতে অব্যাহত হয়। যখন তুমি যে স্পৃহা লাভের জন্য সাগ্রহ চেষ্টা ও সাধনার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন খুঁজে বেড়াও—তখনও প্রকৃতির খোলা বই পড়ে পশু-পাখী, শ্রামল বনানী, গ্রহ-নক্ষত্র—সকলের কাছ থেকে অশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। জীবন কি শুধুই জীবন ধারণ—

“How dull it is to pause, to make an end

To rust unburnished, not to shine in use !

As tho' to breathe were life.”

—Tennyson

রেলে শান্তিকর যাত্রার পর, যখন রাত শেষ হয়ে এসেছে তখন অলক্ষণ বিশ্রাম করে, আমরা আধুনিক যানবাহনে যাত্রা করলাম। জনবিরল পথে মোটর গাড়ি খুব জোরে ছুটে চললে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—গ্রাম থেকে দলে দলে ছোট ছেলেমেয়ে ভীড় করে দাঁড়াল, তরুণীরা এলোচুলে অবাক হয়ে দাঁড়াল, তাদের মনে নেই যে মাথার কাপড় পড়ে গেছে। বোকার মতো পথ জুড়ে দাঁড়াল গরু ভেড়া ছাগল, রাখালের হাতের লাঠি তাদের পিঠে পড়লে ও তাদের ভাষায় চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে তবে তারা সরে গেল—ভাষা না বুঝলেও গালাগালি বুঝতে মুশকিল হল না দেখলাম।

অনেক দিন আগে Wiltshire-এ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে শিকার করছিলাম—একদিন তার অল্প এক অতিথির সঙ্গে দুই German Officer এল। হঠাৎ দেখি বন্ধু শিকারের জায়গা ছেড়ে খোলা পথে দৌড়ে চলে যাচ্ছে—আমি কাছে গেলে সে বলল, “তুমি ফিরে যাও ভায়া, ঐ Germanগুলো পাখী না মেরে আমার দিকে গুলি চালাচ্ছে।” আমি নিজের জায়গায় ফিরে না গিয়ে তাদের দিকে চিৎকার করে দৌড়ে গেলাম। কেউ কার ইংরেজি ভাষা বুঝি না দেখে ইংরেজি ছেড়ে বাছা বাছা বাংলায় গালাগালি দিলাম। দেখলাম আমার মনো-ভাব তারা বুঝল। তারপর তাদের ব্যবহার নির্দোষভাবে শুধরে গেল—কিন্তু হাতের টিপ তেমনি খরাপ রয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক খুব সুন্দর রাজপথে মোটরে যেন উড়ে চললাম। তারপর এ

শৌখিন যানবাহন ছাড়তে হল। হাতীর পিঠে বিনা গদিতে বসে যাওয়া কষ্টকর অথচ এর চেয়ে ভালো বাহন আমার জানা নেই। নদীনালা পেরিয়ে পাহাড়ের পথে চললাম—যদিও জায়গায় জায়গায় পথ এত দুর্গম হবে আশা করিনি। পাহাড়ের পথ সোজা খাড়াই, আবার কোথাও বাঁশবনও অনেক ছিল। একদল লোক এগিয়ে গিয়ে এই সব বাধা সরিয়ে পথ পরিষ্কার করছিল—তাও বড় বড় আলগা ও তীক্ষ্ণধার পাথরের উপর দিয়ে পাহাড়ের উপর হাতী চলেছে কায়ক্লেশে। কখনো হাঁটু গেড়ে, কখনো শুধু গুঁড় দিয়ে গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে নিজেকে টেনে তুলছিল। সবচেয়ে দুর্গম পথ তখনো সামনে—সেটা পাহাড়ের উপর দিয়ে—সরু পথ গেছে একপাশে, অন্য পাশে ছ-সাতশো ফুট নীচে গভীর খাদ আর নীচ দিয়ে দূরন্ত নদী সশব্দে বয়ে চলেছে। আমরা যে সঙ্কীর্ণ পথে চলেছি সেটি তিন ফুটের বেশী চওড়া নয়—আর মাহত আমাদের নানা অতীত কাহিনী শোনাচ্ছিল—একবার একটা বাঘ ও হরিণ মুখোমুখি এসে এ পথে দাঁড়ায় ও হরিণটিকে এক লাফে অনন্ত পথে যেতে হয়। আরেকবার একটি বুনোহাতী পা পিছলে ঐ উন্মত্ত গিরিনদীর বুকে গিয়ে পড়ে ও কোন গতিকে একটি গাছের বড় ডাল হঠাৎ সামনে দেখে তাই ধরে প্রাণ রক্ষা করে। মাহত এ সব কাহিনী শুনিye ভয় দূর করার চেষ্টায় কত সফল হত জানি না। তবে ফরেন্স্ট ইন্সপেক্টর মনে করলেন যে হাতী থেকে নেমে হেঁটে যাওয়া এ পথে নিরাপদ হবে—যদিও পাহাড়ী পথে আলগা পাথরগুলোর উপর পা ফেলা কঠিন হচ্ছিল। হাতী একটুও বিচলিত না হয়ে পথটি পেরিয়ে এল—তবে তাকেও খুব সতর্ক হয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে চলতে হয়েছিল। আমার রবার দেওয়া জুতো ইন্সপেক্টরের চটির সঙ্গে পেরে উঠছিল না। একটি ঘটনার পর তিনি ঘোড়ার পিঠেই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক ঐ চটি-জোড়া ভিন্ন আর কিছুই ব্যবহার করতেন না। তাঁর আরেকটি আদরের বস্তু কাদামী রঙের দেশী টাটুঘোড়া—তাঁর কাছে থেকেই সে প্রায় বুড়ো হয়ে এল—এ রকম বন্ধু তাঁর আর ছিল না। এই জঙ্গলে তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটান ও তাই ত্রিশ মাইলের মধ্যে এখানকার প্রতিটি নদী-নালা পাহাড় হাতের তেলোর মতো জানতেন। তাঁর মতো এ বনপথে আমাদের গাইড করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে আর কেউ পারত না। বনে বনে ঘুরে তাঁর গায়ের রঙ পোড়া ইটের মতো হয়ে গিয়েছিল, ঝড়জল কিছু করতে পারত না, এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ও তিনি বিচলিত হতেন না। তাঁর মন প্রফুল্ল ও শান্ত থাকত। একদিন সকালে দেখি জঙ্গলের জরে ভালুকের মতো কাঁপছেন কিন্তু ভরসা দিয়ে বললেন সন্ধ্যার

আগেই আমাদের শিবিরে পৌঁছবেন। সন্ধ্যার আগেই দেখি তাঁর ঐ brown টাটুতে চড়ে পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বললেন এবার জরটা বেশী হয়নি—জরটা ছাড়তেই প্রাতরাশের সঙ্গে খুব খানিকটা কুইনিন খেয়ে চলে এসেছেন। ভাগ্যবান মানুষ, চটিজোড়া ফেলে দেবার মতো জরটাও সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারেন। হাতীর পায়ে বিশী রকম কাঁটা ফুটলে তিনিই ডাক্তারী করেন। শোবার খাটিয়া যদি খাট হত তিনি একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়েতেড়ে সহজে চলনসই করে তুলতেন। তিনি নিজের আরাগের চেয়ে তাঁবুর সমস্ত লোকজনের কার কি দরকার সেদিকে নজর দিতেন বেশী। কোনো রকম গোল-মাল না করে শিকারীদের কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করতে পটু এমন আমি আর কাউকে দেখিনি। দূরে, জনমানব নেই যে সব জায়গায় সেখানেও কি করে রসদ যোগাড় করতেন দেখে খুশী হতাম, আশ্চর্য হতাম আরও বেশী। দূরত্বের বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত ধারণা ছিল। আমার ‘গোণ্ড’ পথ দেখাতে দেখাতে বলত—শীতকালে এ পথটা দু’মাইল, গরমের সময় চার মাইল। বৈশাখ মাসে মধ্যপ্রদেশের প্রচণ্ড রোদে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে একটা বেজে গেল। রামপেলা জায়গাটি ঠিক পাহাড়ের ওধারে—শুনছিলাম, কিন্তু যেতে যেতে বেলা পড়ে। এল এবং পাহাড়ের ওধারে পৌঁছে জানলাম সেটা রামপেলা নয়—‘ডেসিমালের’ ফুটকির মতো যেন সে পিছিয়েই যাচ্ছে। তবে আমার বন্ধু ইন্সপেক্টর নিজের সামর্থ্যের মাপকাঠি দিয়ে দূরত্ব ঠিক করতেন—বিনা পরিশ্রমে যতটা পথ নিজে যেতে পারতেন বা তাঁর অনুচররা চলতে পারত সেটা তাঁর পক্ষে ঠিক ছিল। একটি ছুতোরের দরকার হওয়ায় শুনলাম সে এল বলে—তাকে গ্রাম থেকে ডাকতে লোক পাঠানো হয়েছে। পরে জানলাম গ্রামটির দূরত্ব দশ মাইলেরও বেশী। একটি খবর পাঠাবার দরকার ছিল প্রায় ২৮ মাইল দূরে। বেলা দুটো অবধি কেউ চিঠি নিয়ে যায়নি দেখে মনে হল তিনি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন না। কিন্তু তাঁকে এ কথা মনে করিয়ে দিতে তিনি হেসে বললেন, ‘কাল সকাল দশটার মধ্যে জবাব নিয়ে আসবে।’ সময় মতো জবাব ঠিকই পেলাম। আমরা শিকারে বেরোচ্ছি ঠিক সেই সময় লোকটিকে দেখলাম জবাব নিয়ে এসেছে। বাইসানের খোঁজে আমি কত সময় দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল হেঁটেছি সে-কথা উল্লেখ করছি না—স্নাইপ মারতেও জলা জমিতে সারাদিন ঘুরেছি। কিন্তু এদের হাঁটার ক্ষমতা আমার কল্পনার বাইরে ছিল, তবে এদের পায়ের কড়া-পড়া মোটা চামড়া দেখে হিংসেও হত, মনে হত অল্প এই সময়টুকুর জন্ত আমার পা দুটো কোনো

জাহ্নতে ঐ রকম হলে মন্দ হত না।

ইন্সপেক্টর ভালো ঘোড়সোয়ার ছিলেন—তবে তাঁর ঐ ব্রাউন টাটুর উপরই। লাগামটি তিনি ছেড়েই রাখতেন—ঘোড়ার গলায় সেটা বুলে থাকত। সোয়ার এক হাতে ছাতা ও অন্ড হাতে পানের ডিবে নিয়ে বসে থাকতেন—টাটুর কখনও বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কখনও দ্রুতভাবে দৃঢ়পদে দৌড়ে চলত। এই দুজনের মনে এমন একটি গুঢ় যোগ ছিল যে একজন নইলে আরেকজনের চলত না। কিন্তু আর কেউ যদি স্পর্ধা করে ব্রাউনের পিঠে চড়বার সাহস করত—তার দুর্দশাই হত—সে হঠাৎ এমন দৌড় দিত যে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে হত সোয়ারকে। আর ব্রাউনকে নিশ্চিন্ত মনে কোনো ঘাসে ভরা উপত্যকায় চরতে দেখা যেত। নিজের মনিবের প্রতি তার মেজাজ খুশী থাকত। তার বয়েসও বেশী হয়ে চলেছে, হয়তো বেশী দিন বাঁচবে না—তবে যখনই এদের বিচ্ছেদের দিনের কথা মনে করি তখনই দুঃখ হয়। আমার গল্পের খেই কোথায় হারাল? সেই পাহাড়ে রাস্তায় ইন্সপেক্টরের পাঁচসিকে দামের চটি তার চেয়ে পঁচিশগুণ দামী আমার বুটজোড়াকে হার মানিয়েছিল। আমরা আবার হাতীতে চড়লাম—বনের ছায়া দেখতে দেখতে দীর্ঘ হয়ে উঠল। সময়টা খুঁটমাসের কিছু আগে। আমার বন্ধু তাঁর শালটি জড়িয়ে চলেছেন দেখে মনে হচ্ছিল উনি আমার ওভারকোটের চেয়ে বেশী গরমে ও আরামে আছেন। অল্পক্ষণ আরামের পর, সকাল আটটা থেকে আমরা ক্রমাগত যেন অবিরাম চলেছি, যাত্রা যেন শেষ হয় না। সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামে এসে পৌঁছলাম—সেটিতে আমাদের আসার কথা নয়। ভুল গ্রাম; এটি হল যে পথ দেখাচ্ছিল সেই গাঁওটির বুদ্ধিভ্রমে। কিন্তু বন্ধু তাতেও না দমে কাঠ যোগাড় করে গনগনে আগুন জালিয়ে আমাদের শ্রান্ত শরীরের বিশ্রাম ও শীত কাটাবার ব্যবস্থা করে সেই শীতের রাতেই ঘোড়ায় চড়ে বিছানা ব্যাগ ইত্যাদির খোঁজে চলে গেলেন। মাঝরাাত্রে ঘোড়ার পায়ের শব্দে বুঝলাম তিনি সেগুলি উদ্ধার করেছেন। খুশী হয়ে উঠলাম। তিনি সেই রাতে ঐভাবে কত বাধা কত সঙ্কটময় পথে গিয়ে কত কষ্ট সহ্য করলেন—যাঁরা এ কাজ করেছেন তাঁরা ভিন্ন অতরা বুঝবেন না।

সকাল হল—পরিষ্কার কনকনে বাতাস। হাঁকাইরা নিজেদের দলে তাদের সামান্য সাধারণ রান্না করতে শুরু করে দিল। জালানি কাঠের অভাব ছিল না, আগুনেরও খুবই প্রয়োজন ছিল ঐ শীতে। বেলা দশটার মধ্যে আমরা শিকারে যাবার জন্য তৈরী—শিকারীরা তাদের খোঁজখবর নিয়ে ফিরেছে। আমরা যে জায়গায় পৌঁছতে হবে সেটা বেশ উচুতে। পথটি দুর্গম ও চড়াইও খুব বেশী ও

বিপজ্জনক। ইম্পেক্টর চটি খুলে এক পাথর থেকে আরেক পাথরে কাঠবেড়ালীর মতো অনায়াসে উঠে গেলেন। শিকারীরাও তাঁর মতো করে চড়ে গেল। আর আমি সেই পথে দু-একবার পড়তে পড়তে সামলেছি ভাবতেও ভয় করছিল। শিকারীরা পাতার পোশাক পরেছিল—কোমর থেকে ঐ ঘাগরাগুলি হাঁটু পর্যন্ত ছিল, কোনো গাছের স্তোত্র পাঁতাগুলি গাঁথা, বেশ খাসা দেখতে ও কোপিনের চেয়ে লজ্জা নিবারণ বেশী হয়। এরা দূর পাহাড়ের গ্রাম থেকে এসেছিল, আদিম অধিবাসীর অভ্যাসগুলি ছাড়ে নি। দু-একজন ছাড়া সকলেরই শরীর সুঠাম ও সুন্দর—তাদের কাপড় খুবই অল্প, কিন্তু যেন তাদের ঐ দেহের সৌন্দর্য, লজ্জা ও শালীনতার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বন পিটিয়ে বাঘ বার করার চেষ্টা বৃথা হল—যাকে খোঁজা হচ্ছিল সে তো চুপ-চাপ পালিয়েছিল। আমরা ঘুরছি খোঁজে, সে তখন অন্ন পাহাড়ের উপর আধ মাইল দূরে জন্তু মেরেছে। কি স্পর্ধা, ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস। তাকে লোভ দেখানোর জন্তু একটা মোষ বাঁধা হয়েছিল—সেটিকে জল খাওয়াতে গিয়ে দেখা গেল বাঘ সেটা হত্যা করে কিছুদূর টেনে নিয়ে গেছে, তার ঘাড় থেকে তখনও রক্ত বয়ে যাচ্ছে। একজন শিকারী বাঘের পায়ের দাগ ধরে যেখানে মোষটা বাঁধা ছিল সেখানে আমাদের নিয়ে গেল। বল পেটানো হল কিন্তু সফল পাওয়া গেল না। বাঘটা সেখানে না থেমে এগিয়ে গেছে। দিনটাও বেশ ঠাণ্ডা ছিল। তাই স্থান পরিবর্তন করতে কষ্ট হয়নি। তার কৃশ দেহের জন্তুই বোধ হয় আগেও ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল। সেদিনকার শিকারে একটি প্রকাণ্ড সাধুর জুটেছিল, সে পাহাড়ের উপর দৌড়ে যাচ্ছিল—আমার '৪১০ করডাইটের গুলি মেরুদণ্ডে লেগে ছড়নুড়িয়ে নালায় পড়ল। তার শরীর নানা জায়গায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, ভাগ্য ভালো যে শিং দুটি অক্ষত ছিল।

সেবার শিকারে যথেষ্ট লাভ হয়—বাঘ ভাল্লুক সাধুর সবই পেয়েছিলাম। তাছাড়া পাহাড় ও জঙ্গলের কুড়ি মাইল অঞ্চলের জ্ঞান লাভ হয়। তাই পরেও এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতে শিকার করার জন্তু ভালো জায়গা বেছে নিতে পেরেছিলাম। যে সব বন্ধু লাভ হয়েছিল—বলতে পারো সেই সময়ের জন্তু প্রয়োজন ছিল—কিন্তু তাঁদের ছাড়া শিকার তখন বা ভবিষ্যতেও সফল হত না। আর সেই ফরেস্ট ইম্পেক্টরের মতো বন্ধু লাভ সহজে হয় না।

বিপদের মন্ডে ঘনিষ্ঠতা হলে তার প্রতি তাম্বিলের ভাব আসে। বিপদের সময় যারা একসঙ্গে থাকে তাদের মতো সাথী আর হয় না—মনের যোগ ও

শ্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে যদি সমভাবে কষ্ট ও আরাম ভোগ করতে পারো তাহলে শিকারে এবং অন্য যে কোনো জায়গায় যাও, সব সময় সব জায়গায় আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করবে।

ফরেস্ট ইন্সপেক্টরের চটি কি করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল সে বৃত্তান্ত না বলে আজকের গল্প আমি শেষ করতে পারছি না। তিনি একবার একটা গাছের তলায় চূপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিক দিয়ে বাঘ আমার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। শিকারের ভালো বাছাই জায়গাগুলি তিনি তাঁর উপরিওয়ালা অফিসার ও তাঁদের বন্ধুদের দিয়েছিলেন। এমন সময় স্বপ্নের মতো স্পষ্ট ধীর শান্তভাবে প্রকাণ্ড বাঘ তাঁর দিকে এগিয়ে এল। আর বিধা না করে ফিরে দৌড়ে, চটিজোড়া ফেলে কাছেই একটা গাছে উঠে পড়লেন। বাঘটাও লাফ দিয়েই এসেছিল—তিনি গাছে উঠতে পেরেই বাঘের কবল এড়াতে পারলেন। আরেকবার পাহাড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অন্য সব ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে চলেছেন—বিপদের কোনো সন্দেহ মনে হয়নি। হঠাৎ ক্রুদ্ধ চাপা গর্জনে সদলবলে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দিনহুপুরে একটি সাঘর হত্যা করে ব্যাঘ্রমশায় সেটি ভোজনে ব্যস্ত—আর আক্রমণ করার মতো গুঁড়ি ঘেরে বসে আছে—ইন্সপেক্টর যে মুহূর্তে দেখলেন বাঘটি তার লেজ এদিক ওদিক নড়াচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে চটি ফেলে তিনি সকলকে গাছে চড়ার পথ দেখালেন। অগ্নরাও তাঁকে অত্মরক্ষা করল। অবিলম্বে ব্যাঘ্ররাজ তার ঐ নিরিবিবি জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করে ঐ রাজকীয় প্রান্তরশে বিষদাতাদের শাস্তি দিতে প্রচণ্ড লক্ষ্যবান্ধ দিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

একদিন একটি বাইসনের খোঁজে নিঃশব্দে যাবার জন্য তাঁকে চটিজোড়াটি গাছের কাছে ফেলে নীচে উপত্যকায় নেমে যেতে হয়। পরে পথ ঠিক করতে না পারায় চটিজোড়াও পাননি—সেজন্য তাঁর মুখে যা দুঃখের ছাপ দেখেছিলাম তা আমি ভুলব না। চটির খোঁজে রীতিমত দল পাঠানো এবং চটি ছুটো পাবার পর তিনি এমন খুশী হন যে বিরহী ও বিরহিনী দীর্ঘ দিনের পর দেখা হয়েও এত আনন্দিত হয় কিনা সন্দেহ। এ ঘটনার শেষটাও বর্ণনার যোগ্য। অনেক সময় গম্ভীর অভিনয়ের পর হাস্যকৌতুকের অভিনয় হয়ে থাকে। আমরা প্রায় সাজানো চারদিকে পাহাড়-ঘেরা কোনো চাবার একটি সুন্দর গোলাবাড়িতে পৌঁছে শুনলাম কয়েক মাইল দূরেই বাঘ জন্তু হত্যা করেছে। আমরা অর্ধবৃত্তাকারভাবে ঘুরে সেখানে পৌঁছলাম। কথা ছিল ‘কপিলাশে’ থেমে সেখান থেকে মোটরে আবার সেই সুন্দর রাজপথে রেলওয়ে স্টেশনে ফিরে যাব। কলকল্লোলিনী একটি

নদীকে যেন ঘুরিয়ে পথ ভুলিয়ে ঐ বিস্তৃত ক্ষেত্রের ভিতর আনা হয়েছিল। সেখানে শস্ত-ফল-ফুলে ভরা ছিল ও গ্রামের কুটিরটি চারদিকের পরিবেশে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কষ্ট করে তাঁবুতে বা ভাঙা মাটির ঘরে থাকার পর এত সুন্দর শান্তিময় জায়গা ছেড়ে অতি অনিচ্ছায় বেলা পাঁচটায় মোটরে যাত্রা করলাম। পৌছবার পরই আবার পাঁচ-ছয় মাইল পথ যেতে হল। হাতী অপেক্ষা করছিল, তাতে চড়ে মাচার পৌছলাম। উজ্জল চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল—তাছাড়া বনের মধ্যে শীতের প্রবলতা ছিল না। একলা চুপ করে বাঘের জন্ত প্রতীক্ষা করছিলাম। যদিও তার দেখা পাবার আশা খুবই কম ছিল কারণ যে রকম দেবী করে ও শব্দে আমরা গিয়েছিলাম—তাতে বাঘেরা লুকিয়ে যায়, নয় চলে যায়। রাত নটায় ছায়া সরে এসে মরা জানোয়ারটি প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছিল। জানতাম বলেই খালি মনে রইল সেটি ওখানে আছে। ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে একটি জন্ত মৃত জানোয়ারটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল—শব্দটি শুনে মনে হয়নি যে কোনো ভারী জন্ত হতে পারে। কিন্তু কে বলতে পারে যে এ বাঘটি অজ্ঞদের চেয়ে সাবধানী ও নিঃশব্দে চলাফেরা করে? আমি স্পষ্ট শুনে পেলাম—জন্তটাকে টানাটানি করে ছিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, দেখলাম বা মনে হল দেখলাম ভক্ষকের পিঠ পরিশ্রমে কেঁপে উঠছে। চোখ বড় করে, অনেক চেষ্টা করেও এর চেয়ে বেশী দেখতে বা বুঝতে পারলাম না। আলো যে আরও উজ্জল হবে, চাঁদের অন্তগামী গতি দেখে সে আশাও ছিল না। তাই সেই ছায়া বাঘেরই এই মনে করে গুলি চালালাম। বন্দুকের শব্দের তীব্র প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ শোনা গেল—সেটি হায়েনার (Hyaena)। নিজেকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ব্যাপারটি হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল। ঘটনাথানেকের মধ্যে আমার নিমন্ত্রণ-কর্তার সঙ্গে দেখা হল—ব্যাপার শুনে তিনিও প্রাণ খুলে আমার হাসিতে যোগ দিলেন। যদিও মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে ব্যাপারটা অজ্ঞ রকম হলেই ভালো হত।

১৮ই জানুয়ারী ১৯১৮

স্নহের অলকা ও কল্যাণ,

চল এবার আমরা বাংলার সমতল ভূমিতে নেমে যাই—সেখানে স্নাইপ, বুনা হাঁস, শুয়োর ও কিছু কিছু অজ্ঞ বড় জানোয়ারের বাসস্থান। যে জায়গা তোমরা

ভালো করে জানো তারই বিষয় বলব। বড় বাঘ, বুনো মোষ ‘চলন’ বিলের জল কমার সঙ্গে সঙ্গে ও চারদিকে পাটের চাষের জন্ত অনেক কাল আগেই তাদের রুচি উপযোগী স্থানে চলে গিয়েছিল।

স্নাইপ

স্নাইপ সেখানে দেরী করে আসে কিন্তু যখন তারা আসে মেঘের মতো আকাশ ঢেকে ফেলে। কলকাতা থেকে অল্প দূরেই নাগাল পাওয়া যায়—আগস্ট মাসের ১২ই-এর মধ্যে কিংবা দু-একদিন আগেই দু-তিন জোড়া স্নাইপ যোগাড় হতে পারে। কিন্তু তখনও পরিশ্রমের তুলনায় কিছুই নয় তবে যদি সবচেয়ে আগে পৌঁছবার ইচ্ছা থাকে, সে কথা আলাদা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে স্নাইপ শিকার করে আনন্দ আছে—এটাই সবচেয়ে ভালো সময়, কিন্তু দেশ গ্রামে ডিসেম্বর অবধি অপেক্ষা করতে হয়। তখন পদ্মবনে ও শেওলার আগাছায় অনেক থাকে। নৌকায় বসে শিকার করার চেয়ে পায়ে হেঁটে শিকার করতেই আমি ভালোবাসি, তাছাড়া সোজা গুলি চালানো যায়। নৌকায় শিকার করার আনন্দ আছে সত্যি তবে সে স্থখ চিরকালের জন্ত নয়। কোনো রকমে গাছের গুঁড়ির তৈরী করা ডোঙা ভারী খারাপ—আর দুটি একসঙ্গে বেঁধে দিলেও টলমল করে, তাল সামলাতে পারে না। অনেক সময় আমি এই রকম একটি ডোঙায় খালের এপার ওপার গেছি, অল্প উপায় ছিল না। কিন্তু সর্বদা একটু ভয় করত কারণ একবার শীতকালে এই রকম অদ্ভুত ডোঙায় খাল পার হতে গিয়ে উল্টে জলে চুবুনি খেয়েছিলাম। যে মাঝি ডোঙা বেয়ে আমায় নিয়ে চলেছিল ডোঙা উল্টে গিয়ে তার কিছুই হয়নি। সে আঁকড়ে পড়ে ও শেষে জল ছেঁচে ফেলেছিল। ভিজ়ে কোপিন পরে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি, আমি সপসপিয়ে ভিজ়ে কোনো রকমে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠলাম। এ দৃশ্যটি দেখার মতো মোটেই ছিল না। আমি ধানক্ষেত ও জলাভূমির উপর দিয়ে হেঁটে চললাম এবং রোদ ও বাতাসে জামাকাপড় শুকিয়ে যেতে বেশী সময় লাগেনি।

এই রকম হাবুডুবু খেয়ে বুঝলাম যে কিছু করা দরকার তখন নিজেই একটি ডোঙা করলাম—তার মাঝখানে বসার জন্ত, চারিদিকে ঘোরে এমন একটি নীচু পিয়ানো বাজাবার টুলের মতো তৈরী করলাম। টুলটি বেশ নীচু—ডান দিকে স্নাইপ উড়লে বেশ ঘুরে মারতে পারতাম। পদ্মবনে পাখী পড়লে খোজা সহজ হত।

কিন্তু শেওলার আগাছায় পড়লে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হত। ডোঙাটা যতদূর পারা যায় আগাছার উপর দিয়ে লম্বা লগি ফেলে নিয়ে যাওয়া হত। একজন তার উপর দিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে পাখী কুড়িয়ে আনতো। অনেক সময় সে টলে টলে যেত আর হাঁটু পর্বন্ত ডুবে যেত। এই গতিবিধি দেখে একটু ঘাবড়ে থাকতাম, যতক্ষণ না সে নিরাপদে ফিরে আসত, মনে শান্তি পেতাম না। হঠাৎ কোনো ছুঁচটনা যদি হয় তাই লম্বা দড়ি রাখা থাকত—যদিও কাজটা বিপজ্জনক তবু মাঝিরা বিশেষ কিছু মনে করত না—এটা যে কিছু অদ্ভুত বা স্বতন্ত্র তা মোটেই ভাবত না।

আমার একটা Bull Terrier কুকুর ছিল, তার নাম Lucy। সে আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ সে শিকারে খুব অহরহ হয়ে ওঠে ও নিপুণভাবে মরা পাখী খুঁজে আনতে পারত। বাধা দেবার আগেই সে আগাছার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত। স্নাইপ খুঁজে আনতে একবার কষ্ট করে তাকে উদ্ধার করা হয়। বেচারী Lucy—এখন সে চিরদিনের জন্য সুন্দর সুখময় মৃগয়া করতে চলে গেছে কিন্তু সে শ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তবু শেষ মুহূর্ত অবধি মুখে স্নাইপটি ধরে রেখেছে—সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না।

বুনো মোষ যখন এই সব আগাছা ভরা জলাভূমিতে চরে—তাদের পায়ের চাপে সব ভেঙে অলিগলি তৈরী হয়ে যায় তখন সে পথে সোজা ডোঙা চালানো যায়। একদিন একদল মোষ বেশ ধীরেস্থে চরছিল—তবে আমার গুলির আওয়াজে চমকে উঠে, পা ছুঁড়ে আগাছা দাবিয়ে দিচ্ছিল—দেখতে বেশ মজা লাগছিল। সব সময় স্নাইপগুলি আমার দিকে তাড়িয়ে আনার জন্য দ্বিতীয় নৌকোয় লোক থাকত। ঐ মোষের দলকে একপাশে রাখার জন্য লোক পাঠালাম এবং নিজের জায়গা একটু বদলে অনেক স্নাইপ মারলাম।

কোনো কোনো বিলে আগাছাপূর্ণ চলন্ত দ্বীপ থাকে। সূর্যের তাপ যতই বেশী হয় স্নাইপের ঝাঁক সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করে। চুপিচুপি অতি সন্তর্পণে নৌকো বেয়ে কাছে পৌঁছতে হয়—কোন দিকে ঝাঁক উড়ে যায় তাও দেখে রাখা উচিত। কতকগুলি পাখী খুব কাছেই লুকিয়ে থাকে, কাছে গেলেই তোমায় চমকে দিয়ে অক্ষত দেহে উড়ে পালায়। ছোট পানদী চড়ে ঘুরে পাখী মারতে যাওয়া সব সময় নিরাপদ নয়, কারণ বিলের গভীর জলে উঠে পড়লে মহা বিপদ ঘটতে পারে।

আমার এক বন্ধু একবার একটি নৌকো উপহার দেন। আমি তার তলার ছুঁধার সমান করে দাঁড় টানার ব্যবস্থা করেছিলাম ও বসার জায়গাও ঠিক

করেছিলাম। ধারা এ বিষয় জানেন তাঁরা বলেন হাঁস মারার জন্ত নৌকোখানি নিরাপদ। একটি ঘটনার দিন মনে আছে এখনও—আমাদের বিলে অনেক বড় হাঁস ও লালশেরা এসেছিল। বিলটা লম্বা চওড়ায় প্রায় চার মাইল। পরিকার কাঁচের মতো স্বচ্ছ জল—ধারে পদ্মবন ও আগাছা। সেই স্বচ্ছ জলের উপর এলাম আগাছার গলি ছেড়ে। পায়ের উপর বন্দুক রেখে যেন আমি উড়েই চলেছিলাম—দু'শ গজ যাবার পর কেন জানি মনে হল বিপদ হতে পারে। শিকারী মাত্রেই বোধহয় কিছু কুসংস্কার থাকে মনে। যাই হোক শত চেষ্টাতেও মনের আশঙ্কা দূর করতে না পেরে মাঝিকে বললাম নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চলতে। আগাছায় বেশ কয়েকটা পাখী মেরে তুলে নিলাম। পাড়ের প্রায় একশ গজ দূর দিয়ে বেশ খুশী মনে বেয়ে চলেছি হঠাৎ আমার ডান পাশের আগাছা ও ঘাসের মধ্যে থেকে একটা স্নাইপ উঠে পিছনে উড়ে গেল। আমি ঘুরে গুলি চাললাম কিন্তু সেই মুহূর্তে জলে পড়ে প্রাণপণ সাঁতার দিতে হল—দেখি মাঝিরও ঐ দশা। সাধের পান্দী হয়ে অতল জলে অদৃশ্য হয়েছে—কয়েকটি মরা স্নাইপ জলের উপর ভাসছে। শিকারের ভারী বুট পায়ে আগাছার মধ্যে সাঁতার দেওয়া দারুণ কষ্টকর মনে হচ্ছিল তবু আমার নতুন Holland and Holland-এর বন্দুকে যাতে জল না লাগে উঁচু করে আঁকড়ে ধরে চলেছিলাম। তীরে পৌঁছবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু শরীর শান্ত হয়ে আসছিল। কিছু দূরেই জলের বাইরে একটা লগি কাদায় পোতা ছিল। গভীর কাদায় পোতা এই লগিতে জেলেরা জাল শুকোতে দেয়। ঐগুলোর একটার কাছে পৌঁছতে পারলেই নিরাপদ হতে পারব। আমার ডান পা আগাছায় আটকে গিয়েছিল তবে বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মন আমার শান্ত ছিল, বিচলিত হইনি। মাঝির অবস্থাও আমার মতোই শোচনীয় যদিও তার পরিচ্ছদের বালাই ছিল না। আমার পরনে বুট ব্রিচেশ যা সহজে খোলাও যায় না। মাঝি খুব জড়িয়ে গিয়েছিল ও হতাশ হয়ে নীচে মাটি কত গভীরে দেখতে গিয়ে বুঝল জল তার নাক পর্যন্ত আছে। সে চিৎকার করে আমায় তার দুরবস্থা জানাল। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল তার মাথাটা জলের উপর ভাসছিল। কোনো গতিকে আমি অশেষ চেষ্টায় তার কাছে পৌঁছে ছুঁথের সাখীর মতো একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলাম। জেলেরা পরে এসে আমাদের উদ্ধার করল। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের সকালে ঐ অবস্থায় মাইলখানেক পথ হাঁটিতে হল। তখন আমায় দেখে কাব্য করার মতো দৃশ্য মনে হত না, কবি টেনিসনও মৎস্যকুমারের শেওলায় জড়িয়ে যাবার বর্ণনা করেননি।

যাঁরা আমার বন্দুক তৈরী করেছিলেন তাঁদের বাহাদুরী না দিয়ে পারি না। এক ফোঁটাও জল বন্দুকের ঘোড়ার ভেতর যায়নি। এই অঘটনের দু'দিনের মধ্যে Manton & Co. বন্দুকের কলকল্লা খুলে রেখেছিল কিন্তু এক সপ্তাহের জগা খুলে রেখেও জলের চিহ্ন পায়নি।

এবারের ও আরেকবারের কথা শুনে ভেবো না যে স্নাইপ শিকার সর্বদাই বিপজ্জনক। একবার একটা নদীর ধারে, যেখানে জোয়ার আসে সেই কোণের কাছে কাছেই চলেছি শিকার করে। আগের অভিজ্ঞতা অনুসারে বিপদ হতে পারে এমন জায়গা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু শিকার করতে করতে সব সময় নীচে মাটি দেখে চলা চলে না। হঠাৎ দেখি কোমর অবধি কাদার ভিতর ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছি। এত শীঘ্র ও অসময়ে পাতালে পৌঁছবার ইচ্ছে ছিল না আর ঐ সঁাতা ও বিরস ব্যাপারের পূর্বাভাস অনুভব করেছিলাম। তাই আরও উৎসাহ ছিল না। আমি ষ্টেগল পাখীর ডানা মেলার মতো হাত দুটো মোজা করে ছড়িয়ে রাখলাম। শিকারীরা আমার অবস্থা দেখে ভীত হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একজন নিজের ধুতিটা খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর সবাই মিলে বোতলের কর্কের ছিপির মতো টানাটানি করে তুলে ফেলল। গর্ত তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় ঐ পাতালের পথ নিরাপদে উঁকি মারার সুবিধে হল না।

সাপের কথা বলতে দু-একবারই বিষাক্ত সাপের সংস্পর্শ এসেছি। এই মোজা ও বুটের উপর সাপ কিছুই করতে পারে না, তাও যদি কোনো রকমে স্পর্শ করে সে বিষয় আমার খুব ভয় হত। দু'বার গোথুরা দেখেছি নদীর ধারে উঁচু জমিতে। একটি কালনাগ ক্ষেতের মাঝখানে শুয়ে ছিল। সময়মত দেখতে পেয়ে আট নম্বর গুলিতে তাকে খণ্ড খণ্ড করেছিলাম। আরেকবার যদিও তার নৈকট্য প্রীতিকর মনে হয়নি। গিরিবন পথ, উপত্যকা, সমতল জঙ্গলে কত জায়গায় ঘুরেছি—কিন্তু এই দু'বার ছাড়া আরেকবার সাপের দেখা পেয়েছিলাম, যখন আমি একটা চিতাবাঘের পিছু নিই। আমি ঘোড়ার উপর চুপ করে বাঁশবনের পাশে বসে ছিলাম হঠাৎ পাতার খসখস শব্দে চেয়ে দেখি নীচে আমার পায়ের কাছের গর্ত থেকে একটি গোথুরা সাপ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। সাপটা এত কাছে ছিল যে, বন্দুকে কাজ হত না, তাছাড়া অত কাছে তাকে ঘাঁটাতে সাহস হচ্ছিল না, ভয় পেয়ে যদি আক্রমণ করে। আমি নিশ্চল হয়ে রুদ্ধশ্বাসে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। দু'বার সে ফিরল, তাকে দেখে আমার শরীর শিঁশির করে উঠেছিল—কিছুতে এ ভাব থামাতে পারিনি। তারপর আবার ফিরে আত্মক্ষেতের দিকে প্রায় পঞ্চাশ

গজ দূরে যে পথে শিকারীরা আসছিল সেই পথে চলে গেল। এক চাবড়া ঘাস ও মাটি ছুঁড়ে তার চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। তার ঐ সুন্দর সর্পিল গতিভঙ্গী বড়ই মুগ্ধকর—যদি না অত বিপজ্জনক হত। আমি চিংকার করে শিকারীদের সতর্ক হয়ে বন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বললাম। সেদিন চিতাটি শিকারের আশা যে আর রইল না সেজন্য কিছু মাত্র আপসোস হয়নি।

এপ্রিলের (April) প্রথমে আসামে বাঘ শিকারে গিয়ে ঐ বড় ঘাসের ধারে অনেক স্নাইপ মেরেছি। হাতীতে চড়ে ঐ ঘাসের মধ্যে এঁকেবেঁকে চলার সময় শিকারীদের অন্য শিকারের স্বেযোগ হত। এই রকম সময় বাংলাদেশের নীচু জমিতেও আমি স্নাইপ দেখেছি। একবার Easter-এর সময় ট্রেন যখন শিলিগুড়ি ও শুকনার মাঝপথে খালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল স্নাইপ দেখেছিলাম। এই সময় আমাদের গ্রামের বিলের শুকনো ঘাসের মধ্যে সর্বদা দু-এক জোড়া স্নাইপ থাকে। মোহনলাল রাস্তা কম্বার জন্ত বিলের শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে চলছিল হঠাৎ ডানার শিসের মতো শব্দ ফিরে দেখি দুটি বেশ মোটাসোটা স্নাইপ উড়ে পালাচ্ছে। পরের বছর ঠিক ঐ জায়গা দিয়ে যাবার সময় ঐভাবে আবার দুটি স্নাইপ দেখি। বলতে পারি না এ দুটি গত বছরের স্নাইপ দম্পতি কিনা।

বাংলা দেশে অনেক বড় বড় দীঘি আছে—এগুলি প্রায় তিন-চার বিঘার বেশী বিস্তৃত। পুরাকালে বিল ও জলাভূমির সুবিধে নিয়ে ক্ষেতে জল দেবার জন্ত এগুলি কাটা হয়েছিল। এখন আর কেউ দেখাশুনো করে না তাই শেওলা ও ঘাসে ভরে গেছে ও গরু ছাগল চরাবার জমি হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে স্নাইপ নিরাপদে আশ্রয় নেয়। দু-একটা গুলি চালালেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে জলার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। তাদের তাড়িয়ে বার করার একমাত্র উপায় একটা দড়ি জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া—কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হয় না।

পাখীগুলোর সন্ধান না জানলেও তারা কোথায় থাকে দেখতে পেলে তাদের আশ্রয় খুঁজে নিতে মুশকিল হয় না। সেপ্টেম্বরের প্রথমে ধানকাটা জমি ও পাটের জমির ধারে ধারে এদের দেখা যায়। মাথার উপর যখন অনেক চিল, শকুন উড়ে বেড়ায় তখন বুঝবে ভালো শিকার পাবার এটি বিশেষ লক্ষণ। অনেক সময় চিল, বাজপাখী উৎপাত করে, মরা বা আহত পাখী একটু বেশী দূরে পড়লে ছোঁ দিয়ে নিয়ে পালায়। চিল যে কি রকম কঠিন প্রাণী তা নিজে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এক রবিবারে একটি চিল আমার স্নাইপ চুরি করে পালাচ্ছিল বলে শাস্তি দিয়েছিলাম—তার ডানা ভেঙে গিয়েছিল, গায়েও লেগেছিল—একজন শিকারীকে

তার যন্ত্রণা শেষ করে দিতে বলায় সে ডাঙা মেরে ফেলে আসে—মরে গেছে ভেবে। পরের রবিবার সেই জায়গা দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি তখনও বেঁচে আছে কিন্তু অতি দুর্বল অবস্থায়। কি করে যে না খেয়ে বেঁচে ছিল, আশ্চর্য লাগে।

একদিনে অনেক স্নাইপ মারা যায় কিন্তু ত্রিশ চল্লিশটির বেশী মারা অন্ডায় মনে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর আমি ও আমার এক বন্ধু একই জায়গায় স্নাইপ মেরেছি—এ সব জায়গা তার অধিকারে ছিল। তাহলেও আমরা অবাধ হত্যা করিনি। তিনি খুব দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিকারী ছিলেন তাই একদিনে প্রচুর হত্যা না করে পরের দিনের শিকারের জন্য রেখে আসতেন। সঙ্গে দু-একটা হাতী থাকত—দূরে অন্ডা জায়গায় যাওয়া সহজ হত—তাজা হয়ে আরও পাখী শিকার হত। একদিনের কথা মনে পড়ে। সবে যেন কালকের—দুপুরে ফিরেছি—এই জমিতেই আগে শিকার করে গেছি। পায়ের কাছে এক ঝাঁক পাখী উড়ে অল্প দূরে গিয়ে মাটিতে নামল। তাদের খুব শ্রান্ত দেখাচ্ছিল। হয়তো অনেক দূর থেকে এসেছে। সংখ্যায় দুই শতেরও বেশী ছিল। এদের দেখে বিহারের এক চাষার পদ্মপালের ঝাঁক তাড়ানোর সে দৃশ্য মনে পড়ে গেল। তাড়া খেয়ে একটু দূরে গিয়ে তারা নেমে পড়ে ছিল। এতদূর থেকে শ্রান্ত হয়ে এসেছে যে তারা আর উড়তে পারছিল না। সেদিন শিকার খুব ভালোই হয়েছিল এবং ইচ্ছা করলে অনেক মেরে সর্বাধিক সংগ্রহের যশ অর্জন করতে পারতাম—কিন্তু সে ইচ্ছা আমাদের হয়নি। চিত্রিত স্নাইপ খুব সুন্দর কিন্তু তার জন্তে গুলি বারুদ খরচ করা শিকারীদের যোগ্য নয়। এদের অতি সহজে চেনা যায়। রঙ-বেরঙের পোশাক ও নৃত্যলীলা দেখে ভুল হবার জো নেই। সংখ্যায়ও এরা কম, অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘাসের জমিতেই পাওয়া যায়। জ্যাক (Jack) স্নাইপ পরে আসে ও অনেকগুলি থাকে না। এগুলি এত ছোট দেখতে যখন চল্লিশ গজ দূরে ওড়ে সেখানে দক্ষ শিকারীর পক্ষেও এদের মারতে পারা বা ফসকে যাওয়া একই রকম। অন্ডা আরও আছে যাদের Fan-tail বলে, কারণ এরা লেজের পালকগুলি হাঁতপাখার মতো মেলে ধরে। এরা আসে দেবীতে, যাওয়াও এদের পরে। Pin-tail-গুলোর লেজ ছুঁচের মতো। এরা খুব তাড়াতাড়ি উড়তে পারে। এদিক-ওদিক যেন বিদ্যুতের গতিতে ওড়ে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে (পচা ভাজের) এদের শিকার আয়াসসাধ্য, যদি না বর্ষার ধোওয়া আকাশভরা কড়া রোদের তীব্রতা মাথার ভিতর অবধি গিয়ে অসহ্য করে তোলে। প্রবাদ আছে যে এই সময় যমরাজের দুয়ার হাট করে খোলা থাকে। ঐ সন্ধ্যাতর্মেতে আবহাওয়ায় জোয়ানদের কিছু হয় না—অন্ডা তাঁর দ্বারেই পৌঁছয়।

শরীর দৃঢ় ও সুস্থ থাকা উচিত, ভাগ্যবলে ও বংশপরম্পরায় যে স্বাস্থ্য ও বৈশিষ্ট্য পেয়েছে সমস্ত নিয়ম যদি মেনে চল, তোমার সহিষ্ণুতা খোলা জায়গার শীত ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে। সূর্যের তাপ বা রৌদ্র স্নান (Sun bath) কার কোনো ক্ষতি করে না—যদি না আগে থেকে স্বাস্থ্যহানি করে থাকে।

আমার 12 bore বন্দুক স্নাইপ মারার পক্ষে যথেষ্ট, তবে 16 bore বন্দুক দিয়ে বিশ্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। তবে মনে হয় বন্দুকের গুণের চেয়ে মাল্লুষের হাতের গুণেই সেটা হতে পেরেছে। বন্দুক ধারা তৈরী করেন, শুনি 16 bore এমন নিপুণভাবে গড়েন যে চল্লিশ গজ দূরেও গুলি বেশ জোরে যায় ও বেশী ছড়িয়ে পড়ে না—ছব্বাগুলো কাছাকাছি লাগে। মেঘলা দিনে যখন ঠাণ্ডা হাওয়া বয় তখন চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে পাখী উড়ে ওঠা কিছু অসম্ভব নয়। তখন ১৬ নং বা ২০ নং বন্দুকের উৎকর্ষতা বেশী। তাই ওটা ব্যবহার করতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। এমন দিনও আসে যখন ১২ নং বয়ে হাত শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন ২০ নং বদলে নিলে নিজের অজান্তে আরামের নিঃশ্বাস পড়ে। কিন্তু পাখীরা যদি এদিক-ওদিক উড়ে তোমার ক্ষিপ্ততার পরীক্ষা করতে জালাতন করে তখন ঐ সুন্দর অস্ত্র ছেড়ে ও শ্রান্তি ভুলে বড় বন্দুক তুলে নিতে হয়। অনেক বছর আগে যখন পাখীর সংখ্যা বেশী ছিল, শিকারীও সংখ্যায় কম ছিল তখন ছুটি অস্ত্র নিয়ে মৃগয়া-লীলা চলেছে কিন্তু এখন অগাঠির প্রতি অত আগ্রহ নেই। সেটি নিরাপদে থাকলেই আমি খুশী হই। তবে এখনও 12 bore-এর আকর্ষণীয় শক্তি আছে—পুরনো দিনের কথা ভুলতে পারি না—যেন দেখতে পাই এই বন্দুক সে সময় আমাদের আশা-তীত। কতশত পাখী মেরেছে—একদিন খুব সকাল সকাল মাঠে পৌছলাম—ভাবলাম সূর্যের তাপটা আরও একটু বাড়ুক—এই আটটা বাজুক আর কি—তখন শুরু করব। তখন দেখি 12 bore-এর মাত্র পঞ্চাশটি কার্তুজ আনা হয়েছে আর 20 bore-এর অনেক বেশী। প্রতি পদে যেখান-সেখান থেকে অনেক পাখী উড়ে এসে আমাদের মন খুশীতে ভরে দিল। কি জানি কি হবে ভাবছিলাম কিন্তু আমাদের হাতের নিপুণতা বুঝে ২০ নং এমন মনস্তুষ্ট করল—তা পাখীর কাছেই উড়ুক বা দূরেই উড়ুক তাতে কোনো মুশকিল হয়নি। দিনের শেষে যখন সবগুলো গুণে দেখলাম—মনে বেশ আনন্দই হল। স্নাইপ শিকারে বেশ মনোমুগ্ধকারী শক্তি আছে ও এক বড় জানোয়ার শিকার ভিন্ন এতেই মন তুষ্ট হয় বেশী। তাছাড়া চোখ ও হাতের দক্ষতা এখানেই হয়, অগতঃ এত বেশী ও ভালো শিক্ষা হয় না। যদিও আগের মতো এদের সংখ্যা বেশী নেই তবু বছরের পর বছর

কাছাকাছি জায়গায় স্নাইপ এখনও পাওয়া যায়। দক্ষতায় সম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে নিজের সময় দিতে হয়, নিজেকেও দিতে হয়—তখন জীবন সংযত রাখতে হয়, অমথা বার্থ হতে দিতে নেই। অল্প বয়সেই না দেখে বন্দুক ভরতে ও দু-চোখ খুলে তীর ছোঁড়ার মতো বন্দুক চালানো অভ্যাস করা ভালো, এতেই নিপুণতা আসে, নইলে চলনসই মতো লাগল কি লাগল না—তাতে কুতিত্ব নেই।

অনেক শিকারী—ছুর্ভাগ্যের বিষয় এঁরা সংখ্যায়ও কম নয়, অসাবধান হয়ে স্নাইপ মারতে গিয়ে ক্ষেতে যারা কাজ করে বা গরু ছাগল চরায় তাদের গায়ে ছুরা মেরেছেন। আর কেউ কেউ লজ্জিত না হয়ে গৌরব বোধ করেছেন। বেশ হেলাফেলা ভাবে বলতে শুনেছি মাদ্রাজে কারু গায়ে লাগলে প্রতি ছুরায় চার আনা মাত্র জরিমানা দিতে হয়। যিনি এই আইন করেছেন তাঁর দেখা পেলে বলতাম, টাকা দুয়ের ছুরা তাঁর শরীরে প্রবেশ করাতে পারলে তাঁর মুখের ভাব কি রকম হত, নিজেই সেটা বুঝে ঠিক করে নিতেন। তাতে আমার আপত্তি নেই। শ্রীযুক্ত ‘ল’ বন্ধুর বন্দুকের অসাবধানতার ফলে ডান চোখটি হারান—এ ছুপের কথা মনে আছে। এখান থেকে বেশী দূরও নয়, মধ্য বঙ্গে একটি ছুর্ঘটনা হয়, যা আজও ভুলতে পারিনি। ভাগ্যের জোরে একবার আমি খুব বেঁচে গেছি। আমার বাঁ কাঁধে জোরে থাপ্পড়ের মতো লাগা ছাড়া কিছু হয়নি। দোষ আমারই—না জেনেগুনে উত্তর-প্রদেশের একজন বড় অফিসারকে স্নাইপ মারতে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটা স্নাইপ উড়ল তবে তাঁর শিকার দেখে আমি পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম—ছুরা আমার গায়ের চামড়ায় লাগেনি কিন্তু কোট ও শার্টের আন্তিন ফুঁড়ে ঝাঁঝা করেছিল—যদিও দূরত্ব প্রায় বাট গজ ছিল। ছেলেবেলায় স্কুলে চড়টা-চাপড়টা খেয়েছি, তাও খুব কোমল নয়, কিন্তু আবার সে সবার ইচ্ছে নেই, তবে এই বীরকে যদি কেউ দু-একটা চড়চাপড় দেয় তা দেখলে খুশী হই নিঃসন্দেহে।

আমরা তার খুড়োর খাতিরে তাকে ‘Boy’ বলে ডাকতাম—সে সুপুরুষ ছিল, আইরিশ বংশে জন্মেছিল। বিলেতের ব্যারিস্টার, শিকারে না হোক অন্ত্র প্রতিপত্তি ছিল। সালগমের ক্ষেতে ‘পার্টিরিজ’ বা তিত্তির মারতে গিয়ে খুড়ো Boy-এর পায়ের ডিমের গভীরতণ্ডা কত পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন ওনং ছুরা দিয়ে। যদিও আইরিশ রক্তপাত দৈবাৎ হয়েছিল তবু সে স্বযোগ খুঁজছিল ও আশী গজ দূর থেকে তাঁর দানের প্রতিদান দিতে ভোলেনি। সারাদিন যে পার্টিরিজটি পকেটে করে বেড়াচ্ছিল সেটি যতদূর সম্ভব জোরে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ডাক্তারী আইন মতে যে কোনো ক্ষেত্রে দুটি হাত নির্মল থাকা চাই—এটাই কর্তব্য। Boy

এই বিধান অনুসরণ করে, আমার মতে কাজটি সে ঠিকই করেছিল।

তরুণ বয়েসে একবার বিশিষ্ট সম্মানিত শিকারীদের সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে অতি অল্পের জন্য গুলি না লাগায় বেঁচে যাই। সেই থেকে এ রকম শিকার থেকে দূরেই থাকি (once bitten twice shy)—এ সব ক্ষেত্রে তোমার সবার পিছনে পড়ে থাকতে হয় ‘সবার পিছে সবার নীচে’—পদ ও খেতাব যাদের আছে, তাঁরাই সম্মানিত অতিথির স্থান ও শিকারে ভালো জায়গা পান। তাছাড়া নিভুলভাবে সব শিকার তাঁদের দিকে তাড়িয়ে পাঠানো হয়—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

হাঁস শিকার

অনেক দিন রোদে গলদঘর্ম হয়ে সাইপ শিকারের পর শীতের দিনগুলি যখন হাঁস শিকারের আকর্ষণ নিয়ে এগিয়ে আসে তখন আরাম মনে হয়। এই হাঁসের দল ভ্রমণশীল; বহু দূর দেশ থেকে আসে, যথা—মানস সরোবর, সাইবিরিয়া ইত্যাদি। তাই যে ক’টা দিন তারা এ দেশে আস্তানা গাড়ে সেই সময়টুকুর জন্য শিকার করা যায়—যদিও সম্প্রতি কয়েক বছর দেখছি তারা সংখ্যায় কমে এসেছে। কয়েক বছর আগেও আমাদের বিল ও পাশের বিল নানা জাতীয় হাঁসের ঝাঁকে ভরে যেত, যথা—লালশেরা, চোখধলা, ত্রিশূল, ঘ্যাঙরেল ইত্যাদি কত নাম বলব, কতই বা বর্ণনা করব। শীঘ্র দেওয়া হাঁসের (whistlingteal) দিকে আমরা দেখেও দেখতাম না। নীল পাখা দেওয়া হাঁস (teal) এত ঝাঁক ঝাঁক উড়ে যেত যেন সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলত—তাদের পাখার শব্দে মনে হত যেন Steamer আসছে। একবার দেশের বাড়ির উপর দিয়ে সন্ধ্যায় এত নীচু দিয়ে সুন্দর লালশেরার ঝাঁক উড়ে চলেছিল যে দু-একটা গুলি ক’দিনের জন্য খাবার জুটিয়ে দিয়েছিল। আমাদের বিলটিতে নিজেও হাঁস মারি না—অন্যদেরও মারতে দিই না। এদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় করে তুলেছি কিন্তু তবুও তাদের সংখ্যা বিশেষ কোনো খাদ্যের অভাবে হ্রাস হচ্ছে কিনা ঠিক বুঝতে পারি না। হয়তো বিলে যে কচুরীপানায় ভরে গিয়েছে তাঁরাই জলের অগ্নি উদ্ভিদ জন্মাতো দিচ্ছে না—যেগুলো হাঁসদের আহাৰ্য; ওখানে তাই এই ছুভিক্ষের মতো দুর্দশা।

রাজহাঁসও ছিল অনেক, তাদের খুঁজে বের করতে মোটেই বেশী সময় লাগত না। লুকিয়ে বসে তারা সহজে কোন্ দিকে উড়ে যায় দেখে, ছোট নৌকো পাঠিয়ে তাদের তাড়া দিয়ে বিশৃঙ্খল করতে পারলেই কাজ হত। পদ্মার চরে শত শত হাঁস বসে থাকত আর পুরুষগুলো ঝাঁকের বড় কর্তাদের মতো প্যাঁক প্যাঁক করে

বকে বকে ঘুরে বেড়াত। এদের ওড়ার গতি ছিল ধীর তাই ঝাঁকের দেখা পেলে উঁচু পাড়ের নীচে লুকিয়ে বসে অনেকগুলি শিকার করা যেত। এরা রাত্রেই ঘুরে খাবার খোঁজে, তাই ধানক্ষেতে যখন আহারে ব্যস্ত ও ভোরে চাঁদের আলোর অস্পষ্টতায় খুব কাছে এগিয়ে মারা যায়। আমার এক খুড়তুতো ভায়ের ছেলে ৪নং Duck gun নিয়ে ঝাঁকে ভিড়ের মধ্যে গলি কেটে জার্মান সৈন্যের মতো এদের ব্যুহ ভেদ করে এত বেশী মারেন যে আমি তার এ রকম শিকার পুনরায় করতে দিইনি। একবার ফেব্রুয়ারী মাসের সকালবেলা পদ্মার উপর দিয়ে হাজার হাজার হাঁস ফিকে বেগুনি আকাশে নিস্পন্দ কম্পহীন পাখা মেলে উড়ে আসতে দেখেছিলাম। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। আমি কখনো ভুলতে পারি না। জলাশয়ের বুকে লালশেরা ভেসে চলে আবার যখন সামান্য বিপদের ভয়ে দলে দলে উড়ে ওঠে—সেটাও ভারি সুন্দর দৃশ্য। এই লালমাথা দেওয়া হাঁসগুলির খুব বড় ঝাঁক থাকে না। পদ্মবনে এদের সহজে খুঁজে বের করা যায় না কারণ পাতার তলায় মিশে থাকে। আগাছা শূন্য খোলা জলেও এরা থাকে না। চোখধলা হাঁস এদের চেয়ে মজবুত ও শরবনে পেলে বেশ অনেক শিকার করা যায়। এরা দু-তিনটে এক সঙ্গে উড়ে ওঠে, ঘাসের উপর এলেই ডান বাঁ ছদিকের বন্দুক চালানো যায়। অহত পাখী তোলার জন্ত থামার দরকার হয় না। মাঝিরা তাদের বহুফলা মাছধরা কোঁচ দিয়ে খুব কোশলে ধরতে পারে। তাদের চোখ এ কাজে এত তীক্ষ্ণ যে জলের উপর সামান্য ঢেউ ও বুদবুদ দেখে ঠিক বুঝতে পারে পাখী কোথায় আছে। ঘাসে আগাছায় লুকনো পাখী ঠোঁট ধরে টেনে বার করতে দেখেছি, মাঝিরা কোথায় পদ্মপাতা একটু ফুলে ভেসে যাচ্ছে দেখে সহজেই বুঝতে পারে তার নীচে পাখী আছে।

ভারতবর্ষে হাঁসদের মধ্যে ত্রিশূল সবচেয়ে সুন্দর। যখন এরা উড়ে চলে আকাশের গায়ে ত্রিশূলের মতো দেখায় বলেই এরা বাংলা দেশে এই নামে প্রচলিত। এরা খুব কোমল ও গভীর জলে থাকতে ভালবাসে। যতই কঠিন প্রাণ শিকারী হন না কেন এই পাখীর রূপ ও রঙের বিচিত্রতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। নীল পাখার (Teal) হাঁস না ত্রিশূল, পুরুষ পাখী—কোন্টি সুন্দর বেশী তা সহজে অহুমান করা যায় না, কে পুরুষের পাবার উপযুক্ত।

সাদা টিলকে (teal) গাছের ফোকরে বাসা করতে দেখেছি। তারা নাকি পোড়ো বাড়ির দেওয়ালের ফাঁক বা কার্নিস এজন্ড বেছে নেয়। শীঘ্র দেওয়া টিলও এদের মতো প্রবাসী নয়—দূরদূরান্তে যায় না, এরা নেহাত সাধারণ লোকের

মতো। তাই এদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি।

কি উপায়ে হাঁসের দিকে এগোতে হয় বা কি করে চালাক রাজহাঁসদের ঘিরতে হয়, অতি সহজে জানতে পারবে—যদি তারা কোনো রকম জলাশয় বা বিলে থাকে বা কোনো নদীতে আনা-যাওয়া করে। সেটা জানলেও তুমি যত বড় নিপুণ শিকারীই হও না কেন বা তোমার খুব দামী অস্ত্র থাকুক, গ্রামের চতুর শিকারীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তারা মাথায় ঘাসের চাবড়া, চলন্ত দ্বীপে ও পদ্মবন ঠেলে কাঁকড়ার মতো চলে একেবারে পাখীর দলের কাছে পৌঁছোয়। পাখীর ঝাঁক সন্দেহ করে না, এরা তাই রাশি রাশি মেরে আনে।

একবার পরীক্ষা করার জন্য আমাদের বাড়ির পুকুরে একটা Spoonbill ও Shoveller হাঁস ছেড়ে দিয়েছিলাম—Spoonbill-এর ডানা ভেঙ্গে গিয়েছিল, অণ্টার ডানা কেটে দিয়েছিলাম যেন পালাতে না পারে। কিছুদিনের মধ্যে তাদের বনের লাজুকতা কেটে গেল কিন্তু পোষা হাঁসের সঙ্গে কিছুতে মিশল না। রাত্রে তারা পুকুরেই থাকতো। বাদলা দিনে জল ছেড়ে মাঠে উঠে আসত। শীতকালে খুব চঞ্চল হয়ে উঠত, আরও অনেক পাখী এসে জুটল। ডানা ভাঙা হাঁস আমারই চিকিৎসায় অনেকটা ভালো হয়ে গেল কিন্তু এটি ছাড়া সবগুলো উড়ে চলে যেত, দিনের বেলায় আবার ফিরে আসতো। মার্চ মাসে বেচারী ভাঙা ডানা হাঁসটিকে একা ফেলে সকলে চলে গেল। পরের অক্টোবরে এই পলাতকের দল সংখ্যায় বেড়ে ফিরে এল, এরা হয়ত এদের শাবক। পরের বছর যখন তাদের আসার সময় হল আমরাই অগত্যা চলে গেলাম। তাই কি হল জানার সুযোগ আর হয়নি।

নীল পাখার হাঁসগুলি সবচেয়ে শেষে প্রবাস যাত্রা করে। আমি অনেক সময় এপ্রিল মাসেও শিকার করেছি, এ সময় যেন নীল রঙ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেবার আমরা তিনজন ছিলাম, জল এত কম ছিল যে নৌকো চালানো যেত না তাই জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে শিকার করতে হয়েছিল। তবে যতগুলি লাভ হল তাতে খুশী মনে ফিরে এলাম। কিন্তু ডাঙায় উঠে হাঁটু থেকে পা অবধি সে কি যে যন্ত্রণা, আগে কখনও এমন হয়নি। এক চাষার টোটকা শুধুধে আরাম হল। পা-টা সাবান দিয়ে ধুয়ে অনেকখানি সরষের তেলে কিছু পাতা দিয়ে মাখিয়ে দিল। আমার বন্ধুরা বয়সে বড় ছিলেন, তাঁদের কিছু হয়নি বলে আমার প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখাননি। কিন্তু সেই রাত্রে খুব ব্যথা হয় এবং সারারাত কষ্ট পেয়েছিলেন তাঁরা। পরের দিন সকালে যখন সব কথা বললেন যেন রাত্রে

কষ্টের লাঘব হয়নি তখনও ।

আমার সেই দিনগুলির স্মৃতিতে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে যখন আমি ‘ম’-দাদার সঙ্গী হয়ে দিনের পর দিন ঝিলের পর ঝিল ঘুরে বেড়িয়েছি, অদম্য উৎসাহে তখনও হংসদল শিকারের উত্তম একটুও কমিনি । এই রকম একদিন আমরা বাড়ির অনেক দূর অবধি চলে গেছি, যদিও শীঘ্র ফেরবার ইচ্ছা ছিল কারণ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘোড়ার সোয়ার হয়ে ফিরতে হবে । সেই বনের মধ্যে কাছাকাছি একটি বাঘ উৎপাত করে বেড়াচ্ছিল । ডিমেশ্বরের মাঝামাঝি এখানে শীতের দিনগুলি সূর্যের আলোয় বাক্বাকে ও চমৎকার । ছুটি দেশী টাটু আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্ত অপেক্ষা করছিল । আমি আগেই ডাঙায় উঠেছি কিন্তু ‘ম’-দাদা কতকগুলি সাদাগলা (merganser), লালঠোঁট, সবুজ মাথাওয়ালা হাঁসের পিছনে অনেক দূর গিয়েছিলেন, এ জাতের পাখী এদিকে খুব অল্পই পাওয়া যায় । যখন তিনি আমার লোলুপ চোখের সামনে ছ’টি সুন্দর হাঁস দেখাতে দেখাতে বিজয়-গর্বে ফিরে এলেন তখন দিনের আলো প্রায় নিভে এসেছে । আমরা আর দেবী না করে টাটু চড়ে ছুটে চললাম । একজন মাঝি ও আরেকজন লোক আমাদের শিকারের হাঁসগুলি বুড়িতে নিয়ে সঙ্গে চলল । রাত এগিয়ে এল, গাছপালা চারদিকে আবছা হয়ে উঠল । একের পর এক সোয়ার হয়ে চলেছি বনের পথে, গোধূলির আলো ক্রমে মসীমাখা হয়ে উঠল । বেশীর ভাগ পথ খোলা মাঠই ছিল, মাঝে মাঝে বড় লম্বা ঘাস ও কয়েকটা বড় গাছ, এ রাস্তায় এলে এমন দিন যেত না যেদিন ধানের ক্ষেতে বুনা গুয়োরগুলোকে তাণ্ডব নৃত্য করতে দেখিনি । তারা অনেক সময় মুখ তুলে আমাদের দেখত । টাটুরা ভয় পেত না, আমরাও তাই কিছু বলতাম না । আমরা মনের শান্তিতেই চলেছিলাম হঠাৎ বাঁদিকে ঘাসে খসখস শব্দ পেলাম । টাটু দুটো থমকে গেল, যেন অত্থ পথে ফিরতে পারলে বাঁচে । তারা থরথর করে কাঁপছিল । এক মুহূর্তের জন্ত শব্দ থেমে গেল তারপর আবার আরম্ভ হল । অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না । সামনে শব্দের জন্ত বুঝলাম একটা বিশাল জন্তু অত্থ দিকে চলে গেল । টাটুরা আমাদের পায়ের ইশারায় চলতে শুরু করল । তবু সাবধানতায় আমরা চলার আগে ৫নং কাতুঁজ বন্দুকে ভরে নিলাম । কিন্তু পাঁচ গজ যেতে না যেতে আবার সেই ভয়াভহ শব্দ হল, বাঁদিকে বেশী দূরেও নয় । তখন আর কিছু না ভেবেচিন্তে সেই দিকেই সশব্দে বন্দুক চালালাম । ঝোপের মধ্যে থেকে ছুঁদাড়া শব্দ এল । তারপর জন্তুটা চলে গেল । আমার টাটুটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল । টাটুর পাশ থেকে উঠে

লাগাম ধরে পাশে পাশে হেঁটে চললাম। সারা পথ মনটা একটা অদ্ভুত ভূতুড়ে আতঙ্কে ভরে রইল, যেন কেউ অহুসরণ করছে। ওটা বাঘই ছিল। টাট্টু ছুটি তাদের জন্মগত স্বাভাবিক প্রকৃতিতেই বিপদটা বুঝতে পেরেছিল, এতে তাদের ভুল হয়নি। এই প্রকৃতিগত অহুমানো তাদের যে ভুল হয়নি তার উদাহরণ দিচ্ছি। আমার ঘোড়া ‘শঙ্কর’ জীবনে কখনও বাঘ-চিটা দেখেনি, তাও আমার মারা বাঘ যখন বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন সেই গন্ধ পেয়েই শঙ্কর ছটফট করে উঠেছিল। আমাদের বাড়ির বারান্দায় বাঘের চামড়া শুকোতে দেওয়া হয়েছিল—ছোট্ট ছুটি চিক্কারা হরিণ লনে (lawn) খেলছিল। হঠাৎ তারা আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল। অলকমণি, এই পোষা হরিণগুলি কেন এ রকম করছে জানার জ্ঞান তোমার খুব কৌতূহল হয়েছিল, আর তোমার ভাই কল্যাণ সব জেনে নিয়ে অণু সকলকে ‘সবজ্ঞাস্তার’ মতো বলে বেড়ালো। যখন বন থেকে এনেছি এই হরিণগুলি খুবই ছোট ছিল। এরা এখনই সব ঘাস খেতে শিখছে। বাঘ দেখেনি, চামড়াও তাদের নজরের বাইরে ছিল, তাও তারা গন্ধ পেয়েই ভয়ে অস্থির।

বুনোশুয়ার শিকার

পোলো (Polo) খেলার রাজা। শুয়ার শিকার মৃগয়ায় রাজকীয়। অল্প বয়সে এ শিকার সামর্থ্যের বাইরে ছিল আর বয়স যখন কিছু বাড়ল তখন যৌবনের এ সব খেলায় ছাড়তে হল। তাঁবুতে ক্লাব (Tent Club) করা অতীতেই হত। আর রাসায়নিক নীলের আবিষ্কারে ও অণু নানা কারণে নীল আবাদকারীরা অন্তর্ধান হয়েছে। জার্মান, ইহুদী ও অল্প ভদ্র ইংরেজ এদের জায়গায় এসেছে কিন্তু তারা অণু রকম। দু-চারজন ভদ্র ইংরেজ যা আছে তারাও সহকর্মী ও স্বজাতি ও বন্দুদের সঙ্গে মিশে ওঁদের মতো তাঁরাও মৃগয়াপ্রীতি হারিয়েছেন। যাঁরা বাংলার জেলায় আছেন তাঁদের এই শিকারে অল্পরক্ত করার চেষ্টা বুঝা। বাঘ ভাল্লুক ইত্যাদি বড় জন্তু শিকারেও উৎসাহ নেই, তাস-পাশার মোহে মুগ্ধ হয়ে অণু পুরুষোচিত খেলাধুলা ও মৃগয়ার আনন্দ পাবার শক্তি নেই। গ্রামবাসী ও সাধারণ লোকের নানা কাজ দেখারও উৎসাহ নেই। এখন যাঁরা দেশের ও দেশের বিষয় জানতে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করেন তাঁরা চৌকিদারের মুখের কথায় যা শোনেন তাই যথেষ্ট মনে করেন—এই যেন শিক্ষার চরম পরাকাষ্ঠা। স্বাস্থ্য, কৃষি, রাজনৈতিক সব জ্ঞানই তার ঘেন আছে। ডিস্ট্রিক্ট অফিসার কলম পিণ্ডে সব বিষয়ে

অবাস্তব বিবরণী লিখে পাঠান, আরামে আপিসে বসেই সব কাজ সমাধা করেন। এর চেয়ে যদি বরাহ শিকার বা আধুনিক বন্দুক হাতে গ্রাম অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সব অবস্থা জানবার চেষ্টা করতেন তাতে তাঁর অভিজ্ঞতা হত এবং গ্রামের রাস্তাগুলির ভালোভাবে সংশোধন হত। দু-একজন সিভিল সার্জেন ডাক্তার ছাড়া এঁরাও সকলে বন্দুক ও বর্শা ইত্যাদি বিষয়ে বই পড়া বিস্তার অভিমত জাহির করেন—এঁদের এই সব অস্ত্রের সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। এক আইরিশ কমিশনার তাঁর অধীনে যে সব বড় বড় বাংলার জেলা ছিল সেখানে যে সব অফিসার বন্দুক চালাতে বা ঘোড়ায় চড়তে জানেন না তাঁদের কাজের ভার ও শাসনের অধিকার দিতেন না। আমি তাঁর এই মত সমর্থন করি। সে যাই হোক আজকাল যে দু-চারজন আবাদকারী জমিদার হয়ে বসেছেন বা ব্যবসায়ী বা আইনজ্ঞ তাঁরা ছাড়া কারু বিশেষ শিকারে উৎসাহ দেখা যায় না। স্থানীয় কয়েকজন আইন ব্যবসায়ী খেলাধুলা শুরু করা ও উৎসবের নামেই ভীত হয়ে উঠেছিলেন—তাঁদের মতে ধনী বয়স্ক আইন ব্যবসায়ীদের অসময়ে জীবন নির্বাপিত করার উদ্দেশ্য এ সব।

বরাহ শিকারে আমার জ্ঞান পূর্ণ নয়, তাই তোমায় এ-বিষয় শিক্ষার জন্য অপর দক্ষ লোকের পরামর্শ দরকার, যিনি তোমায় এই চমৎকার মুগ্ধকর মৃগয়া নিপুণভাবে শেখাতে পারবেন। এ বিষয় শেষ করার আগে আরও দু-একটি ঘটনার বিষয় না বলে পারছি না। বরাহের পরাজয় হয়েছিল কিন্তু কিছু কৌতুকও ছিল হাস্যবাহ্য মতো। বিখ্যাত শিকারীদ্বয় Simpson ও Baden Powell-এর লেখা অনেক বই পড়েছিলাম ও মৃগয়ার ক্ষেত্রে গিয়ে Brodraj অপেক্ষা Simmy ও তার চেয়ে ভালো Bayonet কোন্টা ব্যবহারে নিজের অভিজ্ঞতা দেখাব মনে মনে স্থির করেছিলাম—আমার সঙ্গীরা এ সবে দরকার মনে করেননি। খোলা মাঠ—প্রথম যখন একটি গুয়ের বেরিয়ে এল সকলেই মনে করলাম এর সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে পারা যাবে। আমি ও আমার দুজন সঙ্গী—Joris ও Direk-এ নাম তাদের ছিল না—যাই হোক আমরা তিনজনে ঘোড়া দৌড় করলাম বুনো গুয়েরটির পিছনে—তাঁদের ঘোড়া বেশী ভালো ছিল তাই তাঁরা এগিয়ে গেলেন—আমিও তাঁদের কাছে পৌঁছিলাম। শিকারের নিয়ম সম্পূর্ণরূপে আমার মত কেউ মেনে চলেননি। প্রথমত গুয়েরের যত কাছে যেতে পারা যায় ততই ভালো। আমার ঘোড়াটি যত কাছে যেতে পারে ততই গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, গুয়ের যেখানে যেতে পারে, ঘোড়াও ততদূর যেতে পারে। তৃতীয়ত, ঘোড়া কোথায় পা

ফেলবে সে ভবনা তার, তোমার নয়। তাই ঘোড়ায় দৃঢ়ভাবে বসে রইলাম, মনে করলাম এ সব ‘অ-আ-ক-খ’-র মতোই সহজ। ঘোড়ার কর্তব্য তার উপর ছেড়ে দিলাম। মাঠের মাঝে একটা গর্ত ছিল, গুয়ার লাফ দিল, আমার ঘোড়াও তাই করল। আমি তার পিঠ থেকে গুয়ারটার পিছনেই পড়লাম। জল, কাদামাটিতে ঘোরাকেরা তার অভ্যাস—সে চটপট উঠে পালাল, আমার দিকে দেখলও না। আমি সেই কাদায় পড়ার পর যতদূর সম্ভব নিজেকে পরিকার করে নিয়ে আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। Direk কাছেই ছিল, Jorisও বেশী দূরে ছিল না। হঠাৎ গুয়ারটা ফিরে চক্ষের নিমেষে Direk-এর ঘোড়াকে দাঁতের গুঁতোয় বেশ খানিকটা চিরে দিল। Joris-এর ঘোড়া অনায়াসে গুয়ারের উপর দিয়ে চলে গেল ও Joris তার বর্শাখানি গুয়ারের গায়ে বিঁধিয়ে চলে গেল। এবার আমার পাল। এতক্ষণে বরাহ একেবারে ‘যুদ্ধে দেহি’ ভাবে মুখ খুলে আমার দিকে তেড়ে এল। পিঠে তার Joris-এর ভারী বর্শা আটকে বিপজ্জনকভাবে এদিক-ওদিক নড়ছিল। বাংলা দেশের মানসমুদ্র আমার হাতে নির্ভর করছে। তাছাড়া কাদা থেকে উঠে এই সম্মান লাভ করতে পারব না? কি করে কি হল বলতে পারব না—মনে নেই কিছু, তবে সে লাফিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের বর্শা তার গলা থেকে কাঁধ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। ঘোড়া বেকে দাঁড়াবার জ্ঞান, না আমার হাতের নিপুণতায়, নাকি গুয়ারটার জ্ঞান এ রকম হল বলা শক্ত। যখন ঘোড়া ফিরিয়ে দাঁড়ালাম, দেখি গুয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে—প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে তবু শেষ অবধি হার মানতে চায় না।

সেদিন আরও অনেক গুয়ার মারা হয় তবে প্রথম বর্শা নিক্ষেপের সম্মান আমার—পরে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। আরেকটা ঘটনার বিষয় বলছি। একটা গুয়ার লাফ দিয়ে নালায় নামে—নালার পাড় এমন খাড়া ছিল যে তার পক্ষে পালাতে হলে যে পথ দিয়ে নেমেছিল সেই পথেই ফিরতে হত—আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। তাকে অন্য পথে তাড়িয়ে বার করার চেষ্টা বৃথা হল। পালাতে না পেয়ে সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আগে যেমন আমি পায়ে হেঁটে শিকার করেছি সেই রকম করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। অন্তরা ঘোড়ায় যাবেন বলে পিছনে রইলেন। আমায় হেঁটে আসতে দেখে বরাহরাজের আর ধৈর্য মইল না—সে তীরবেগে এগিয়ে এল। ভালোই হল—বর্শা তার ঐ বেগের জ্ঞান আরও অন্তরে ঢুকে গেল ও সে নালায় পড়ে মরে গেল। বেচারী HL. আগেই সকলের সঙ্গে সঙ্গে ছিল, শারীরিক দুর্বলতার জ্ঞান ঘোড়ায় না চড়ে পায়ে হেঁটে

আসছিল। যখন সে আমার কাঁধে হাত রেখে পরম উৎসাহে বাহবা দিল তখন এত খুশী হলাম যা আগে কখনও হইনি।

ঐতিহাসিক পলানীতে যে শুয়োর শিকার দেখেছিলাম সে কথা না বললে আমাদের আইনজ্ঞ সভার (Bar-এর) প্রতি অবিচার করা হবে। এর নায়ক আমারই সহকর্মী। সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি যা বলেছিলেন, খনিকটা হয়তো বলেননি—তাতে বুঝেছিলাম ঘোড়া থেকে সশব্দে শুয়োরের পিছনে পড়ে যাওয়ায় মাটিতে যে বিরাট গর্ত হয়েছিল তা হয়তো ক্লাইভের কামানের গোলায় হতে পারত কিনা সন্দেহ। শুকরী ও বাচ্ছাগুলি এ দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। মা-বাপ ও বাচ্ছাগুলি সেই সকাল থেকে আর কোনো দিন ও পথে যায়নি, তার কাছাকাছিও মাড়ায়নি। সেই থেকে তিনি অশ্বারোহীদের মামলা ছেড়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় মন দিয়েছেন, এতে তাঁর অর্থ ও যশ ছুই-ই বেড়েছে।

একটা কথা বলে রাখি, শুয়োর তাড়িয়ে শিকার করার আগে ‘Paper Chase’ করতে শেখা উচিত।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯১৮

স্নেহের অলকা ও কল্যাণ

শিকার আমার কাছে চিরন্তন। আমি Tennyson-এর ‘Brook’-এর মতো অবিশ্রান্ত, অনর্গল বলে-যেতে পারতাম। আপাতত বন্দুক ও রাইফেলের বিষয় বলে শেষ করার ইচ্ছা। সব শিকার সব সময় একই বন্দুক দিয়ে কাজ হবে—তা সম্ভব নয়। বহুকাল আগেই আমি ‘কালো বারুদের’ ব্যবহার ত্যাগ করেছি। তাই তার দোষগুণ বিচার করব না। Cordite তার স্থানে এসেছে এবং এ বন্দুক সহজে বদলাব না। এর মহাগুণ হল এর গুলির ফলাফল তুমি নিজে দেখতে পাও ও পায়ে হেঁটে শিকার করার পক্ষে এটি খুব নিরাপদ অস্ত্র। ঝোপঝাড়ে ও কুয়াশা ঢাকা দিনে কালো বারুদের ধোঁয়া অন্ধকারে ঢেকে দেয় তখন হেঁটে শিকার করা বিপজ্জনক। বাঘ ুচিতা ভালুক বাইসন—তোমার দেখার আগেই তারা তোমায় দেখে ফেলে। তোমার গুলির আঘাত কতটা জানতে পারা যায় না। ধোঁয়ার আঁধার ছেড়ে বেরুনোও বিপদ—বিশেষতঃ যদি জন্তু কাছাকাছিই থাকে।

অনেক সময় শুনেছি যে আমাদের দেশের আবহাওয়া Cordite গুলির পক্ষে ভালো নয়। তিন বছরের পুরনো গুলির উপর ভরসা করা চলে না। অনেক

সময় গুলি বেড়ায় না বা কিছুক্ষণ পরে, সেটা আরও বিপজ্জনক। আবহাওয়ার চেয়ে শিকারীর অসাবধানতার উপরই সব নির্ভর করে। গত কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, আমি যা করি, খাঁদের কাছে আমি কাতুঁজ কিনি তাঁদের বলে দিই যে পাঠাবার সময় এক বাঞ্চে দশ বারোটি রেখে দেথবেন যেন হাওয়া বাতাস না ঢোকে। এগুলো আমি আবার ফ্ল্যানেলের লাইনিং দেওয়া চামড়া বা কাঠের বাঞ্চে রাখি, আর সেগুলো জলে ভেজে না (waterproof) এমন আলমারিতে রাখি। হিংস্র স্বাপদ শিকারে যাবার আগে যতগুলি দরকার ততগুলি বাঞ্চ সঙ্গে নিই। শিকার থেকে ফেরার পর যেগুলো বাকি থাকে তা হরিণ মারার জন্য বা দ্বিতীয়বার আহত জন্তুর উপর চালাবার জন্য আলাদা ফ্ল্যানেলের ব্যাগে রাখি। এ কাজ নিজের হাতে করা উচিত। অনেকে চাকরের উপর নির্ভর করেন, এমন কি খুব বিশ্বাসী চাকর থাকলেও তা করা ঠিক নয়। খাঁরা হাওদায় বসেন বা মাচা থেকে শিকার করেন তাঁদের গুলি ফসকালে বা সময় মতো আওয়াজ না হলে, তাঁরা কাতুঁজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। গুলি ফসকালে বা আওয়াজ না হলে শিকার ও শরীরের উপর প্রভাব ভালো হয় না। এ বিষয় আমার সৌভাগ্য দেখে বন্ধুরা আশ্চর্য হন, কিন্তু এ সবই আমার বিশেষ সাবধানতার কৃতিত্ব—এ রকম সতর্কভাবে রাখায় পনেরো বছরের কাতুঁজ শুধু দেখতেই ভালো দেখায় না, নতুনের মতো কাজও করে।

তুমি যদি অপব্যয় না কর—তোমার hobby যদি একটা নীমার মধ্যে রাখতে পারো তাহলে পঞ্চাশটি কাতুঁজে এক একবারে শিকার চালিয়ে নিতে পারো। বছরে সব রকম বন্দুক বা রাইফলে এর চেয়ে বেশী গুলি দরকার হয় না।

আমার মনে হয় '৪৬৫, '৪৭০ বা '৪২৫ দোনলা রাইফল ও '৪৮০ গ্রেন গুলি ব্যবহার করলে ও '৩৫০ হরিণ চিঙ্কারা বা হিমালয় প্রদেশের হরিণ মারার পক্ষে যথেষ্ট। প্রধানত এমন বন্দুক দরকার যার গুলিতে আহত জন্তু একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। অনেকে small bore ও Smooth bore বন্দুক দিয়ে হিংস্র জন্তু মারার কথা বলেন। আগেকার কালে smooth bore-এর জন্য ভারী 'বুলেট' বিশেষ ভাবে তৈরী হত তাতে দূরের জন্তু কাছ থেকে মারলে যে কাজ হত, সেই রকম জোরে লাগত। এখন (Ball and Shotgun) গুলি ও ছব্রা ব্যবহার করার বন্দুক অল্প সব বন্দুকের স্থান অধিকার করেছে। আমি Holland & Holland-এর পক্ষে ওকালতি করতে চাই না কিন্তু তাঁদের তৈরী 12 bore Paradox যে বন্দুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এ কথা বলতে একটুও দ্বিধা হয়

না। আমার বন্ধুরা, যারা নিজেদের ইচ্ছায় বা আমার সুপারিশে এই বন্দুক ব্যবহার করেছেন তাঁদের সকলেই বলেছেন যাটগজ দূর অবধি বাঘ, ভাল্লুক, নাঘর শিকারে এর মতো ভালো আর কোন বন্দুক নেই, এটাই শ্রেষ্ঠ। তবে এই paradox চিতাবাঘ শিকারের জন্য একটু বেশী বড়, এর গুলিও ভারী—খাজ কেটে যাওয়া উচিত, যেখানে সেখানে এ গুলি জন্তুর শরীর ভেদ করে যায়। আমি একবার ত্রিশ গজ দূরে একটি বাঘিনী মারি—মরে গেলে দেখা গেল গুলিটি বুকের ভিতর থেকে ডান কাঁধের চামড়া ছেদ করে একেবারে পেটে গিয়ে পৌঁছেছে, গুলির কোনো চেহারাও বদলায়নি। নিজের কথা বলতে—বাইসনের উপর এর গুলির কি আশ্চর্য শক্তি তা আগেই বলেছি—তবে আবার সে পরীক্ষা করার ইচ্ছে করি না; সর্বদা পায়ে হেঁটে শিকার করি বা করেছি—যা অনেকে নিরাপদ নয় মনে করেন। ঠিক সেইজন্যই আমি আজও রাইফলের উপর নির্ভর করেছি, অনেক সময় খুব কাছ থেকে মেরেছি, প্রায় সব শিকারেই '৪৬৫ বা '৪৫০ রাইফল ব্যবহার করেছি। Soft nosed bullet একেবারে ভেদ করে যায় তাই তার চেয়ে Velopex (ছুঁচলো গুলি) ব্যবহার করা ভালো। ভাল্লুক বা নাঘরের চেয়ে বাঘ বা চিতা শিকারেই এ কথা বেশী খাটে। তাড়াতাড়ি মন স্থির করতে পারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও জানোয়ারের শরীরের anatomy জানা ও বিশেষ দরকার। এ জ্ঞান থাকলে তবেই ঠিক কোন্ জায়গায় গুলি করতে হয় জানতে পারবে। আমি বাঘ বা চিতার মাথায় গুলি মারি না, কারণ এদের মাথার ঘিলু পিছন দিকে একটা খুলিতে থাকে। বাঘের ঘিলুর খুলি কমলা লেবুর চেয়ে ছোট, চিতার আরো ছোট। একবার একটা চিতা নীচে তেড়ে আসায় আমি তার নাকের উপর গুলি করি। তার আক্রমণ থামলেও সে চলেই আসছিল, তখন বাঁ নলের গুলি তার কাঁধে মারতেই সে ছমড়ে মরে পড়ল। ওর খুলি খুলে দেখেছিলাম গুলি নীচে নেমে গিয়ে চোয়াল ছুটি এমন ভাবে ভেঙেছে যেন কুড়ুল দিয়ে সমান ভাবে কাটা হয়েছে। এ সব গুলি এমন অদ্ভুত ভাবে জন্তুর দেহে পথ কেটে চলে যে আশ্চর্য লাগে; অনেক সময় নরম অস্থিমজ্জা এর জন্য দায়ী।

Smooth bore বন্দুক রাইফলের চেয়ে সস্তা ও হালকা এবং হাতে নিয়ে চলাফেরা সহজ বলে অনেকে এটি ব্যবহার করেন কিন্তু বাঘ ভাল্লুক শিকারে একেবারেই নিরাপদ নয়। তবে রাইফলের লাইসেন্স পাওয়া এত মুশকিল যে সেজন্যও অনেকে সহজে যা পাওয়া যায় তাই কেনেন। বিজ্ঞাপনে এদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য যারা কেনেন, হিংস্র জন্তু শিকারে কোনো না কোনো সময় দুর্ঘটনা হয়তো ঘটে। রাইফল

খুব জোরে আঘাত দেয়, এর লক্ষ্যও ভুল হয় না, আর তাই এত নির্ভরশীল ও নিরাপদ মনে হয়। যে ব্যক্তি Smooth bore ও রাইফল (Rifle) দুই ব্যবহার করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিধামাত্র হওয়া উচিত নয়। যদি তিনি সত্যি বড় জানোয়ার শিকার করতে চান তাঁর পক্ষে রাইফলই ভালো। নয়তো শিকারে বিপদ যদি না-ই হয়, দুঃখ পাবার ও নিরাশ হবার সম্ভাবনা থাকে। দু'নলা (Cordite 465) রাইফল বা অন্য কোনো বন্দুক যাতে সমান ওজনের ৪৮০ গ্রেনের বুলেট ছোঁড়া যায় বা সব রকম শিকার চলে তার সঙ্গে অন্য বন্দুকের তুলনা হয় না। এর সমকক্ষ হিসাবে Royal Nitro Paradox 12 bore-এর নাম করা যায়, তবে যদি পায়ে হেঁটে, অনুসন্ধান করে বাইসন শিকার করার আকাঙ্ক্ষা থাকে তোমার, তাহলে 577 Cordite নিলে সব বিপদ ও নিরাশা থেকে রক্ষা পাবে। পাহাড়ে জঙ্গলে চিক্কারা বা ঐ জাতীয় হরিণ মারার পক্ষে একনলা ৩৭৫ magazine rifle শুধু চলেই না, বলতে গেলে অপরিহার্য। ছোট বন্দুক সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই বলে আশ্বাও নেই। সর্বদা মনে হয়েছে ধাতুর দৃঢ়তা ও ওজনের উপরই শেষ রক্ষা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও হাতের দৃঢ়তারও বিশেষ প্রয়োজন। রাইফল ছোঁড়ার পূর্ণ দক্ষতা লাভ করতে হলে সর্বদা এটি ব্যবহার ও নাড়াচাড়া করতে হয়। বনে জঙ্গলে আমার যে জ্ঞান লাভ হয়েছে—বিপদের সামনে এসে তা কি উপায়ে এড়াতে হয় শিখেছি; তাই মনে হয় অন্য পথ আর নেই।

রাইফল স্ট্র্যাপে ঝুলিয়ে নিয়ে চলা অনাবশ্যক, হাওদায় বসে বা মাচা থেকে শিকারে এভাবে নেবার দরকার হয় না, ও পায়ে হেঁটেও শিকার করতে গেলে বিপদ হতে পারে। কাঁধে বোলে তাই বাধা পড়ে, তার চেয়ে রাইফল হাতে নেওয়াই ভালো। আমার বন্দুকগুলোতে কোথাও বোলাবার জন্ম ছিদ্র রাখিনি। একটি রাইফল এই রকম ঝুলিয়ে নেবার ব্যবস্থা ছিল—ঘন জঙ্গলের মধ্যে যেতে যেতে তার মধ্যে একটি ছোট ডাল ঢুক সঙ্কট মুহূর্তে বাধার সৃষ্টি করে—তারপর থেকে ওটা ঘষিয়ে তুলে চিহ্নও রাখিনি।

বানান করা যেমন খেয়ালের উপর নির্ভর করে, বন্দুক বেছে নেওয়াও শিকারীর অভিরুচিতে করা হয়। Sam Waller নাম লিখতে যেমন W লিখতে হয় তেমনি হাঁস ও স্নাইপ মারার বন্দুক তার উপযুক্ত হওয়া উচিত। হাঁস শিকারের আধুনিক বন্দুকটি এমন নিপুণভাবে তৈরী হয়েছে যে 4 bore বন্দুক হলেও ছুঁড়তে কাঁধে বিশেষ ধাক্কা লাগে না। এ বন্দুকটি আমি বিশেষ ব্যবহার করিনি কারণ অযথা হত্যাকে আমি শিকার মনে করি না। তবে এ

দিয়ে একশো ত্রিশ গজ দূরে যে বড় হাঁস নির্ঘাত মারা যায় বড় গুলি দিয়ে, এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। আমার এই দৈত্যাকার বন্দুকটি হুখে আরামে আলমারিতে কালক্ষেপ করছে, যত দিন না তুমি এর চেয়ে লম্বায় বড় হয়ে ওঠো। এই বন্দুক ব্যবহারে ধাকা খেতাম দেখে এক মাঝি পিছন থেকে হাত দিয়ে আমার একবার সামলাতে চেষ্টা করায় গুলি লক্ষ্যের অনেক দূর গিয়ে পড়ে, শিকারও নষ্ট হয়। মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা। একজন শিকারী ঠিক সন্ধ্যা মুহূর্তে আমার হাত ধরে টেনে শিকার ভণ্ডুল করেছিল। এক চাঁদনী রাতে K.G.B ও আমি দুটি মাচায় বসে বাঘের অপেক্ষায় ছিলাম। যে টাটুটি বাঁধা ছিল একটি প্রকাণ্ড ভাল্লুক তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দু-তিনবার হুঙ্কার দিতে টাটুটি ভয়ে দড়ি ছিড়ে পালাল না দেখে পরমুহূর্তে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। একজন শিকারী হুঁহাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে আমার ডানদিকে বসে ছিল। তাকে আগে থেকে নড়তে মানা করেছিলাম—কিন্তু সে ভীত ও উত্তেজিত হয়ে না ভেবে-চিন্তে আমার হাত ধরে টানল, ফলে গুলি কোথায় উধাও হল, শিকারও ফসকাল। তার এই পাগলের মতো ব্যবহারের পর আমি আর কখনও কাউকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বসা ছেড়েছি।

শিকারের সাজসরঞ্জাম প্রত্যেকের রুচি মতো হওয়া উচিত—এ বিষয় নিজের নিজের স্বাধীনতা থাকা ভালো, অন্যের উপর জোর করাও উচিত নয়। পোশাক পরিচ্ছদ দেখতে যেমনই হোক রঙের উপর লক্ষ্য রাখা দরকার। পোশাক যেমন আরামের হতে হবে তেমনই রঙ এমন হওয়া চাই যাতে অদৃশ্যভাবে থাকতে পারা যায়। দুটোই খুব দরকার।

আমি নিজের পছন্দমত একটি কোট করিয়েছি তাতে যেমন আরাম পাই তেমনি আবার এটা পরে ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, খেলাধুলা করা চলে—কোন বিষয় একে হারাতে পারবে না। আমার ভয় ছিল যে কেউ না ভাবে আমি Brongham, Wellington, Spencer-এর মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাই দু-চারজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কাউকে বলিনি, কিন্তু তাঁরা Herman ও Rankin Tailors-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে এ কোটের নাম দিলেন ‘KNC Coat’। আমি অমরত্ব লাভ করতে চাই না, সদ্ব্রাক্ষণের মতো দেবশর্মণঃ লিখতে পারলেই সন্তুষ্ট। ডোডো (Dodo) পাখীর মতো Brongham অন্তর্ধান করছে—Wellingtonও ট্রেক খোঁড়ার আগে পুঁতে গেছে—Spencer-এর আর ফ্যাসান নেই। পার্থিব সবই ক্ষণস্থায়ী তবু যে সব দোকান সৈনিকদের পোশাক

তৈরী করে সেখানে গেলে তোমার জ্ঞাত তারা এই সুন্দর কোর্টটি তৈরী করে দেবে, শিকারে এটা তোমার খুব কাজে লাগবে, সেটা আমি নিশ্চয় বলতে পারি। পাশ্চাত্য হিসাবে এটা খুব ফিটফাট ক্যাসানদুরস্ত ও প্রাচ্য রীতি অনুসারে এটি সুকৃতিপূর্ণ ও চমৎকার—আস্তিন যতটা ইচ্ছা প্রশস্ত করতে পারো, আর কোমরের বেটে যখন বোতাম লাগাবে (তা রোগাই হও বা মোটাই হও) তখন সৈনিকের পোশাকের মতো সৌষ্ঠবপূর্ণ দেখাবে। মানুষের উদ্ভাবন দক্ষতায় অনেক দিনের অহুবিধা ভোগ করা শিকারীদের পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কি করতে পারি বল?

আধুনিক সৈন্য—খাওয়া নয়, ধূমপান করেই যুদ্ধ করে। প্রলোভন এড়াতে হলে প্রলোভনের বশে থাকতে হয়, কথায় তাই বলে নাকি? একদিন দারুণ শীতের দিনে Regent Street-এ যেতে যেতে একটি 'Murias' কিনে ফেললাম। দোকানদার এটি নিজেই বেছে দিয়েছিল। আমি এই পাতায় মোড়া Murias-এ যে কি মাধুর্য ছিল সেটাই উপভোগ করছিলাম। যখন বাইরে এলাম চারিদিকে একটুও হাওয়া বাতাস ছিল না, যার ফলে এই ধূমের স্বগন্ধ একটুও উড়িয়ে অপচয় করার ভয় ছিল না। এই চুরুট এক নতুন স্বখ ও আনন্দের সৃষ্টি করল—কিন্তু এ তো চিরস্থায়ী নয়। দেশে ফিরে বেশী দিন লাগেনি জানতে যে আমার দম রাখার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে—যদিও আমি পাইপ ও চুরুট ছাড়া সিগারেট কখনো ব্যবহার করিনি। বুঝলাম শিকারে যখন ডান নলের গুলি ফসকালো, এ দোষ ঐ মনোহর ধূমপানের জন্তই হল। শিকারের জন্তে স্নায়ুশক্তি ও নিঃশ্বাসের ক্ষমতা কমা উচিত নয়। যার মনের জোর আছে তার পক্ষে কষ্টকর হলেও ধূমপান ছাড়া যায়। এ বদ্ অভ্যাস আজ ছাড়ব কাল ছাড়ব করলে চলে না—এটা নাপিতের দোকানের বিজ্ঞাপনের মতো দেখায়, 'কাল বিনা পয়সায় কামানো হবে' সে কালকে'র, দিন কখনোই আসে না। তাই তোমায় আমার উপদেশ—এ অভ্যাস না করাই ভালো। কড়া পানীয় তাদের জন্ত, যারা বাঁচতে চায় না। মদ জিনিসটা সাপের মতো কামড়ায়। তাই তোমায় বলি, কল্যাণ, এ অভ্যাস ও প্রবৃত্তি থেকে দূরে থেকে।

শিকারে যেতে আমি রেলের ও অল্প সব কর্মচারীদের কাছে সব সময় যে সাহায্য ও অশেষ ভদ্র ব্যবহার পেয়েছি সেজন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত হবে। একবার একজন উচ্চপদস্থ অফিসিয়াল—যিনি নিজেও বেশ দক্ষ শিকারী—বনের একটি শ্রেষ্ঠ অঞ্চল (block) আমার জন্ত রেখে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ করেন।

আমি সুদূর বাংলা দেশ থেকে আসছি শুনে তিনি এ সৌজন্য দেখান, যদিও আমি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। আরেকবার পুলিশের একজন সেরা অফিসার বাংলা দেশ থেকে অতদূর শিকারে এসেছি জেনে, বিনা অনুরোধেই সাহায্য দরকার কিনা জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছিলেন। আমার মনের গভীরতর স্থান দেখলে দেখবে অশেষ কৃতজ্ঞতার থৈ পাবে না। সে-সব বনের কর্মচারীদের আতিথ্য ও নিঃস্বার্থ সাহায্য আমার সর্বদা মনে থাকবে। মধ্যপ্রদেশের সামন্ত রাজারা তাঁদের চমৎকার ও সুন্দর রাজ্যের বনজঙ্গলে আমার ইচ্ছামত মৃগয়ার অধিকার দিয়েছেন, তাঁদের এই বদান্যতার জন্য তাঁরা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আসামের একজন সামন্ত রাজা—যিনি নিজেও সুদক্ষ শিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আতিথ্যে ও সহায় সাহায্যে বহু শিকার করে সেই সব বিজয়গৌরবে নিজের গৃহ সাজাতে পেরেছি—তা ভিন্ন আমার এ আকাজক্ষা পূর্ণ হত না।

৩০শে জুন ১৯১৮

আমার স্নেহের ছেলেমেয়ে,

প্রায় এক বছর হল এ চিঠিগুলো লিখতে শুরু করেছিলাম। করুণা বেড়ে উঠেছে আর কালিপ্রসাদ নিজস্ব জাহির করতে আরম্ভ করেছে, এখন সেও বাইসন ও বুনো মোষ, কৃষ্ণসার ও সাম্বর হরিণ, বাঘ ও চিতার তফাত বোঝে। এখন তোমরা চারজন আমায় ঘিরে বসেছ তাই আরও দু-চারটে কথা বলে আমার এ চিঠি শেষ করব।

যখন মুহূর্তের জ্ঞাত ও অমর কবি কালিদাসের বনানী বর্ণনার মধ্যে ফিরে যাওয়া যায় প্রতি মুহূর্তে প্রতি পঙ্ক্তিতে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও লেখার অপূর্ব ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হতে হয় :—

“গ্রীবাভঙ্গাভিরামং স্কন্ধরত্নপততি স্কন্দনে দত্তদৃষ্টঃ

পশ্চাচ্চেন্দ্রেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদভ্রুয়সাঁ পূর্বকায়ম্।

দর্ভৈরদ্ধাবলীটেঃ শ্রমবিবৃতমুখত্রংশিভিঃ কীর্ণবস্ত্রাণি

পশ্চাদগ্রপ্লুতবাদ্ বিয়তি বহুতর স্তোকমুখ্যাং প্রয়াতি ॥”

হরিণ একদৃষ্টে বারবার গ্রীবা ঘুরিয়ে দেখছে, তীরের আঘাতের ভয়ে তার দেহের পিছনের ভাগ যেন পূর্বের ভাগে ঢুকে পড়েছে—শ্রমক্লান্ত মুখ থেকে তার

আন্ধে চিবানো ঘাস পথে ঝরে পড়ছে—এমন উচুতে দীর্ঘ লাফ দিচ্ছে যেন মাটি ছেড়ে আকাশে পৌঁছে গেছে।

আবার কালিদাস মৃগয়ার প্রশংসা করে বলেছেন—

“মেদশ্ছেদকুশোদারং লঘু ভবুত্যাঅ্যানযোগাং বপুঃ

সস্তানামপি লক্ষ্যাতে বিকৃতিসঙ্কিতং ভয়ক্ৰোধয়োঃ ।

উৎকর্ষঃ স চ ধ্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে

মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীচ্ছগ্নিনোদঃ কুতঃ ॥”

মৃগয়ায় শরীর দৃঢ় ও মেদশূন্য ও ক্লেশ হয়—পশুর ভয় ও ক্রোধ জানা যায়, শিকারী চলন্ত লক্ষ্যে নিপুণতা লাভ করে মৃগয়াকে ব্যসন আখ্যা দেওয়া মিথ্যা—শরীর ও মনে এ রকম আমোদ আর কিসে পাবে?

দেখ আমার শরীরে ‘প্রথর তপন তাপে’র প্রভাব পড়েছে—বনজঙ্গলের শ্রীতিতে মন ভরে উঠেছে। প্রতিদিন সকালে বন্দুক হাতে বনজঙ্গলে নতুন নতুন আশায়, উৎসাহে আনন্দ লাভ করেছি—আজ তাই সে সব তোমাদের বলতে চেষ্টা করলাম। যথার্থ শিকারী যিনি মৃগয়ায় অল্পরক্ত—তিনি জানেন বনজঙ্গলে হিংস্র স্বাপদ অল্পসরণ করে যে আনন্দ পেয়েছেন তাতে জীবহত্যার আগ্রহ নেই। প্রকৃতির পরিচয়, তার অপূর্ব সূন্দর দৃশ্য দেখে জীবনে অনেক আনন্দ উপভোগ করেছেন। সেই সব অভিজ্ঞতা ও ‘নানা রঙের দিনগুলি’ জীবন উজ্জ্বল করে রেখেছে। শোন Browning কি বলেছেন :

“Oh, our manhood’s prime vigour !

Not a muscle is stopped in its playing

nor sinew unbraced.

Oh, the wild joy of liring ! the leaping from

rock to rock

The strong rending of boughs from firtree

—the cool silver shock

Of the plunge in a pool’s living water—

the hunt of the bear,

And the sultriness showing the lion is conched in

his lair”

পৌরুষের চরম উৎসাহ, যৌবনের উদ্দাম কৌতুক, বাধাহীন পদক্ষেপ—দৃঢ়
বিশাল বৃক্ষের শাখা বিদীর্ণ করায়, উত্তাল তরঙ্গে অকুণ্ঠিত সন্তরণ, মৃগয়ায় হিংস্র
জীব অন্বেষণ ও অহুসরণ সবই জীবনের আনন্দ গান।

Walt Witman বলেছেন যে—“বাচ খেলায় যারা দাঁড় টেনে জেতে ও যারা
হারে—দুই-ই জীবন।” জীবন প্রবল সাগ্রহ ও আস্তরিক। এই তো জীবন—
যেখানে হারজিৎ নেই—“আমরা সমান খেলি জিতে হারে” (রবীন্দ্রনাথ)। খেলায়
বর্বরতাকে বাধা দিতে পারলেই হল—এ খেলায় লাভই বেশী—শরীর সবল ও সুস্থ
হয়, বুদ্ধি বাড়ে, মন প্রশান্ত হয়।

Robert Louis Stevenson-এর কথাগুলি মনে গেঁথে রেখ : “প্রকৃতির
সুন্দর দৃশ্য সর্বদা দেখলে বুদ্ধি ও মন যে রকম স্তম্ভিত হয় ও দীপ্তি লাভ করে
আর কিছতে হয় না। উদয় ও অস্তগামী সূর্যের সুন্দর দৃশ্য কতখানি শিক্ষা দিতে
পারে সকলে বুঝতে পারে না। প্রকৃতির প্রতিটি সুন্দর দৃশ্য মনের উপর অসীম
প্রভাব বিস্তার করে—দেখা না গেলেও তা স্থির নিশ্চিত।

কালিদাস :—“বিশ্রামং লভতামিদঞ্চ শিথিলজ্যাবন্ধমশ্লকহু।”

আমার ধন্য ও বাণ বিশ্রাম লাভ করুক, জ্যা শিথিল করে আমিও বিশ্রাম
করি। ইতি—

আশীর্বাদক (তোমাদের পিতা)

শ্রীকুমদনাথ চৌধুরী